# অন্ধকারে আলোর রেখা

সমরেশ বসু

বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৬৮
মে, ১৯৬১

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
অশোক কুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী :
প্রবীর সেন

# অন্ধকারে আলোর রেখা

তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপে আমি কখনো রত হইনি। অতএব সে-হিসাবে আমি নিজেকে একজন অভিজ্ঞ তান্ত্রিক বলতে পারি না। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি কয়েকজন হিন্দু তান্ত্রিক এবং সহজিয়া তন্ত্রসাধক সাধিকার সঙ্গলাভ করেছি। তাঁদের ধর্মীয় বৈঠকে, আলোচনামূলক নানা কথা শুনেছি। এমন কি তাঁদের চক্রে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছি। সৌভাগ্য বলছি এই কারণে, তন্ত্রসাধনার সমস্ত বিষয়ই অত্যন্ত গুহ্য এবং গোপনীয়। সাধক সাধিকাদের একান্ত নিজস্ব বিষয়, যা একমাত্র তাঁরা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন। সহজিয়া সাধকরা তাঁদের নিজেদের মধ্যে, এক ধরনের প্রতিজ্ঞাসূচক শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন, যা আমি তাঁদের কাছেই শুনেছি, "আপন সাধন কথা/না কহিবে যথা তথা।"

বর্ধমান জেলার প্রত্যন্তদেশের একটি গ্রামে—যার একটি সীমা বীরভূম জেলা ও গঙ্গার অপরপারে মুর্শিদাবাদ, এক কৌলমার্গী সাধক তান্ত্রিক তাঁর চক্রে আমাকে, এমন কি বাহ্যিক অংশগ্রহণেও অনুমতি দিয়েছিলেন। সে-বিষয়ে আমি পরে সবিস্তর বর্ণনা দেবো। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "এই সাধনার এক নাম ভোগ মোক্ষ। অর্থাৎ ভোগের দ্বারা মোক্ষলাভ। অথবা বলতে পারো, ভোগের মধ্য দিয়ে যোগ। এই 'ভোগ' বিষয়টি সাধনার এমন একটি অঙ্গ, অনেকেই একে সহজ ভেবে ব্যভিচার মনে করতে পারে। 'অনধিকারী' ব্যক্তিকে আমরা 'পশু' জ্ঞান করি। অতএব তাদের কাছে আমাদের সাধন বিষয় অবশ্যই গোপন রাখতে হবে। কারণ, পঞ্চ 'ম' কারে তারা নিজেরাই প্রলুব্ধ হতে পারে। নিজের হীন প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিতে পারে। মানুষ মাত্রেই

মদ মাংস মৎস্য মুদ্রা আর মৈথুনে লুব্ধ হতে পারে। কিন্তু তারা গুরুর দ্বারা শোধন সাধন কিছুই পায় না। গুহ্যাতিগুহ্য কঠিন সাধনার মর্ম বা মন্ত্রও তারা কিছুই জানে না। সেই জন্যই, বাইরের লোকের কাছে শক্ত নারকেলের খোলের মধ্যে শাস এবং জলের মতোই আমাদের সাধন বিষয়কে গোপন রাখি।" এই বয়স্ক অথচ স্বাস্থ্যবান ব্রাহ্মণ সাধক আমাকে আরও বলেছিলেন, "তোমাদের হয় তো ধারণা, তন্ত্রশাস্ত্র বেদ বা উপনিষদ বহির্ভূত ধর্ম। আদৌ তা নয়। তন্ত্র আরও প্রাচীন, তারই নিদর্শন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, 'বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। নাপ্রশন্তিয় দাতব্যং নাপুত্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ।' পুরাকল্পে বেদান্তে যে গুহ্য পরমতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা, প্রশান্ত নয়, ছেলে বা শিষ্য নয়, তাকে দেবে না।"

যে-সাধন বিষয়ে এই প্রকারের নিষেধ এবং গোপনীয়তা মেনে চলা হয়, তার কিছু কিঞ্চিৎ সাক্ষী থাকতে পারা, সাধকদের কাছ থেকে তাঁদের সাধন প্রণালী ও তত্ত্ব বিষয়ে কিছু জানতে পারা নিশ্চয়ই সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু সঠিকভাবে বলতে গেলে, একজন হিন্দু তন্ত্র সাধকের এবং তাঁর উত্তরসাধিকা ভৈরবী এবং আসন্ন অভিষেকের জন্য প্রতীক্ষামনা একজন কুমারী সাধিকার সাক্ষাৎ ও সাহচর্য অতি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম ১৯৭৭ এর নভেম্বরে, আসামের কামাখ্যা পাহাড়ে। বস্তুত তন্ত্র সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক ব্যাখ্যা আমি সেই তান্ত্রিক সাধক এবং তাঁর সাধিকার কাছেই শুনেছিলাম, যা আমাকে বিস্মিত এবং বিহ্বল করেছিল। আমি তাদের বিশ্বাস স্নেহ এবং ভালবাসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং তাঁদের বাহ্যিক পোশাক-আশাক বসনভূষণ আচার ব্যবহার আমাদের মতো সাধারণের থেকে আলাদা হলেও, যে-কদিন তাঁদের সঙ্গলাভ করেছিলাম, মনে হয়েছিল, আমি যেন একটি পবিত্র স্নেহকোমল পরিবারের আশ্রয়ে আছি। কোনো সন্দেহ নেই, সেই সাধক পুরুষ, আমরা যাকে আধুনিক জ্ঞান বা শিক্ষা বলি, তা তাঁর যথেষ্ট আয়ত্তে ছিল। তিনি কেবল তন্ত্র বিষয়ে তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন নি,

আমার মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে, তাঁর অনুকম্পাতেই আমি এক আশাতীত চক্রানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। বর্ধমানের সেই সাধকের মতো তিনি আমাকে কোনো বাহ্যিক অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করতে দেননি, কিন্তু আমার জীবনের বিরলতম, এবং প্রথম চক্রানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন। বিরলতম বলছি এই কারণে, পঞ্চ 'ম' কারের যেটি শেষ ও প্রধান ক্রিয়া মৈথুন, যাকে তাঁরা বলে থাকেন, "শিব স্বরূপ সাধকের সঙ্গে শিবস্বরূপিনী সাধিকার সংযোগ" শুধু তারই সাক্ষী ছিলাম না। সেই উজ্জ্বল প্রভাময়ী কুমারী সাধিকা যিনি দীক্ষান্তে, নিজেকে পূর্ণ অভিষেকের জন্য কঠিন সাধনার দ্বারা প্রস্তুত করেছিলেন, এক উজ্জ্বলকান্তি যুবাপুরুষ সাধকের সঙ্গে, সেই চক্রে তাদের মিলন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অবিশ্যি সেই চক্রে, সেই সাধক তান্ত্রিক পুরুষ এবং তাঁর সাধন সঙ্গিনীর অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, তিনি যেন চক্রটিকে পরিচালনা করছিলেন, এবং তাঁর নবীন শিষ্যশিষ্যার পরীক্ষা নিচ্ছিলেন। সেই চক্রানুষ্ঠানের তিন দিন আগে, নবীন সাধকের আবির্ভাব হয়েছিল। নবীন সাধকের আবির্ভাব আকস্মিক কোনো ঘটনা না, আগে থেকেই দিনক্ষণ অনুযায়ী সব যোগাযোগ এবং ব্যবস্থা ছিল। তন্ত্রের সাধন সঙ্গিনী বিষয়ে আমার কতকগুলো অস্পষ্ট ধারণা ছিল। তন্ত্র সাধকরা তাঁদের সাধকসঙ্গিনীদের 'শক্তি' বা 'ভৈরবী' আখ্যা দিয়ে থাকেন, আর সেই ভাবেই তাঁকে পূজা ও বরণ করেন। কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের মধ্যে যে এক শ্রেণীর বিবাহের প্রচলন আছে, এ কথা আমি আগে কখনো শুনিনি।

আগে কখনো শুনিনি বলার কারণ, আমি নিজে শাক্ত পরিবারের সন্তান। তন্ত্র ও তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বলার আগে, ভূমিকা হিসাবে আগেই সে-কথাটা বলে নেওয়া উচিত। কিন্তু আমার এই পরিচয়ের দ্বারা এ কথা বলা যায় না, শাক্ত পরিবারে জন্মালেও, আমাদের গৃহে আমি কখনো তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ দেখেছি। আমার

বাবা এবং মায়ের যিনি গুরুদেব ছিলেন, তাঁকে আমি ছেলেবেলায় দেখেছি, আমাদের প্রাক বিভক্ত বাংলাদেশের ঢাকা শহরের বাড়িতে। মাস কয়েক আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় তার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আজানুলম্বিত বাহু সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষ। বড় বড় চোখ দুটো লাল। দুই হাতের ডানায় রুদ্রাক্ষের তাগা, গলায় রুদ্রাক্ষের ও প্রবালের মালা। তার মাথা ছিল মুণ্ডিত, কিন্তু শিখার সঙ্গে একটি জটা মাথায় জড়ানো থাকতো। গেরুয়া বস্ত্র কচ্ছহীন আর গায়ে এক টুকরো চাদরের মতো ব্যবহার করতেন। কপালে সিঁদুরের বড় ফোঁটা। গায়ের নানাখানে ভস্মের প্রলেপ। পায়ে খড়ম। তাঁর গম্ভীর মোটা স্বরের হাঁক শুনলে ভয় পেতাম, অট্টহাসি শুনলে ভয়ে পালিয়ে যেতাম। অথচ আমার বাবার শ্যামাসঙ্গীত শুনতে শুনতে তাঁর চোখ বেয়ে জল গড়াতো,এবং একরকমের ভাবাবেশ হতো। তিনি সব সময়েই সদলবলে চলাফেরা করতেন। বাবা মায়ের সঙ্গে একাধিকবার তাঁর গৃহে গিয়েছি, দেখেছি একটি ঘরের বড় এক কুলুঙ্গিতে লাল বস্ত্রের ওপর রক্ষিত একটি সিন্দুর চর্চিত নরকরোটি. আর সিন্দুর মাখানো একটি ত্রিশুল। পাশেই পটে আঁকা কালীর মূর্তি এবং কাপড়ের ওপর আঁকা তিনটি 'যন্ত্র'। আসলে সেগুলো যে 'যন্ত্র' তা আমি তখন মোটেই বুঝতাম না। বড় হয়ে জেনেছি, তান্ত্রিক কল্পনায়, দেহের অভ্যন্তরে কল্পিত বিভিন্ন নাড়ির অঙ্কিত সংকেত চিহ্নই যন্ত্র। মূলতঃ এই যন্ত্রের কল্পনা পুরুষের লিঙ্গ ও নারীর যোনিকে ও পায়ুস্থানকে কেন্দ্র করে, মস্তিষ্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষয়টিকে হিন্দু তান্ত্রিকেরা নানা মন্ত্র আর ক্রিয়ার দ্বারা অত্যন্ত জটিল করে তুলেছেন। আসলে বিষয়টি অতিমাত্রা কামকলা বিষয়ক। সহজিয়া সাধকবৃন্দ আমাকে বিষয়টি অনেক বেশি প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এ বিষয়ে হিন্দু ও সহজিয়া সাধকদের বক্তব্য আমি আরও বিস্তারিত ভাবে বলবো।

যাই হোক, শাক্ত পরিবারের সন্তান বলেই,আমার এই মধ্য বয়সেও তন্ত্র সম্পর্কে বিশদ জানবার একটা কৌতূহল রয়ে গিয়েছে কী না

জানি না। কিন্তু আমি অনেক সাধকের দ্বারস্থ হয়েছি, বা আমাকে যেন কেউ হাতছানি দিয়ে তাঁদের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছে। অথচ প্রথম যৌবনেই আমার বাবার মুখে "উর্দ্ধরেতঃ সিদ্ধপুরুষের" কথা শুনে অবিশ্বাস বশতঃ হেসে উঠে, বেশ শক্ত হাতের একটি চড় খেয়েছিলাম। পরবর্তীকালে আমি সাধকদের সঙ্গলাভ করে আর অবিশ্বাস বশতঃ হেসে উঠতে পারিনি।

অনেক বস্তুতান্ত্রিক তাত্বিক অবিশ্যি "সাধন" বিষয়টিকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে আদি মানব গোষ্ঠীর জমির উর্বরতা, ফসলের ফলন বৃদ্ধি সেই কারণে নানা জাদুমন্ত্র ও যৌনক্রিয়াকেই, তন্ত্রের মূল বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সেই সঙ্গে মাতৃতান্ত্রিক জগতের অনেক বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণার উল্লেখ করেছেন। এ কথা ঠিক, জন্মরহস্য অজ্ঞাত আদিম মানুষ নারীকে এক অপার রহস্যময়ী মহাশক্তি বলেই বিশ্বাস করতো। পরবর্তী বহুকাল পরেও, সব জেনেও, নারীর প্রাধান্য কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি, এবং তন্ত্রের সঙ্গে এ বিষয়ের যোগাযোগ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁদের ব্যাখ্যানুযায়ী তন্ত্র একটি ধর্মীয় বিকৃতি মাত্র। এটা বিশ্বাসযোগ্য না। বস্তুতপক্ষে এই তান্ত্রিকগণ তন্ত্রের "যৌগিক" ক্রিয়াকাণ্ডের কোনো মূল্যই দিতে চান নি। কেবল আদিম উর্বরা শক্তির জাদু যৌনক্রিয়ার ওপর একটি আরোপিত আধ্যাত্মিক ধর্মীয় রূপ দিতে চেয়েছেন।

তন্ত্র—তা হিন্দু, বৌদ্ধ, সহজিয়া যে-কোনো মতেরই হোক, সাধকদের সিদ্ধিলাভের প্রথম ও প্রধান ক্রিয়া যোগ সাধনা। বলতে গেলে, যোগ সাধনা ছাড়া, এ পথে কেউ অগ্রসর হতেই পারে না।

আমার এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রকাশের আগে, তন্ত্রে বিবাহের প্রচলন বিষয়টির উল্লেখ করে নিই। কামাখ্যা পাহাড়ের সেই তান্ত্রিক আশ্রমে, আমি জেনেছিলুম, কুমারী সাধিকার সঙ্গে যুবা পুরুষ সাধকের বিশেষ একটি মতে বিবাহ হয়েছিল। আমাদের সনাতনধর্মী সমাজে প্রচলিত বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলা যায়। এই বিবাহের পত্নী গৃহেশ্বরী।

আর তান্ত্রিক কুলচক্রে শৈব বিবাহের বিহিত আছে। এ বিবাহও দুই রকম। এক চক্রানুষ্ঠানকালের জন্য। দুই সারাজীবনের জন্য। সেই কুমারী সাধিকার সঙ্গে সাধকের প্রথমোক্ত মতে বিবাহ হয়েছিল, এবং এই বিবাহের স্ত্রীকে ভৈরবীচক্রে গ্রহণ করা যায়, এবং তাকে পরশক্তি বা পরকীয়া শক্তি বলা হয়। বলাবাহুল্য বিবাহের পৌরহিত্য করেছিলেন সেই তত্ত্বজ্ঞানী তান্ত্রিক সাধক এবং তিনি আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, ব্রাহ্মবিবাহের স্ত্রীকে যদি শৈববিবাহের দ্বারা সংস্কৃত করা হয়, তবে তাকে ভৈরবীচক্রে গ্রহণ করা যায়। সাধনসঙ্গিনী দুই রকম, স্বকীয়া আর পারকীয়া। এটি পরকীয়া।"

আমার আঠারো বছর বয়সে, কলকাতার উপকণ্ঠে গঙ্গার তীরে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। স্থানটিকে সাধুঘাট বলা হয়। সেখানে বট আর অশ্বত্থ গাছের নিবিড় ছায়াতলে বিস্তৃত বেদীতে দু তিনটি ছোটখাটো মাটির ঘর ছিল। সেই ঘরগুলোতে কয়েকজন জটাজুটধারী সাধুর বাস ছিল। তাঁদের সম্পর্কে আমার বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল না, এবং সঠিক জানতাম না, তাঁরা কোন্ সম্প্রদায়ের। মুখ চেনা ছিল অনেকেরই। অধিকাংশই ছিলেন ভস্মাচ্ছাদিত কৌপীনধারী। আশপাশ অঞ্চল থেকে ভক্ত নরনারীদের আগমন ঘটতো। অনেক সময় সাধুদের কেউ কেউ আমার কাছে 'দান' চাইতেন। দান মানেই পয়সা, যা দিয়ে আমার পুণ্য লাভের উপায়।

একদিন সাধুঘাটে বেড়াতে গিয়ে, হঠাৎ বৃষ্টি এসে যায়। আমি সাধুদের আস্তানায় ঢুকে পড়ি। প্রথমে ভেবেছিলাম কেউ নেই। কিন্তু একটি ঘরের দরজা খোলা ছিল এবং সেই ঘরে একজন গোঁফ-দাড়িওয়ালা মাথায় জটা সাধু বসেছিলেন। আমাকে দেখে তিনি ভিতরে ডাকলেন, "আও বেটা, অন্দরমে আকে বৈঠো।"

মাথার ওপরে গাছ আমাকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচাতে পারছিল না। আমি ঘরের ভিতরে গিয়েছিলাম। গঙ্গার দিকে একটি ছোটো

ফোকর ছাড়া আর কোনো জানলা ছিল না। দরজাও একটিই। সাধু আমাকে বসতে বললেন। আমি বসলাম। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসলেন, তারপরে বললেন, "আমি তোমাকে যোগ দেখাতে চাই, দেখবে ?"

আমি তাঁর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারিনি। খানিকটা অবিশ্বাস এবং হাস্যকর কিছু দেখবার আশায় বলেছিলাম, "দেখবো"।

সাধুর গায়ে একটি গেরুয়া কাপড় জড়ানো ছিল। সেটি খুলে তিনি দরজার সামনে থেকে সরে এক পাশে বসলেন। আমি কিছু ভেল্কি দেখার আশায় কৌতূহলিত। কিন্তু আমি হতচকিত বিস্ময়ে দেখলাম, সাধু তাঁর একমাত্র পরিহিত কৌপীনটি কোমর থেকে খুলে ফেললেন। তিনি একেবারেই নগ্ন, এবং আমি অধিকতর বিস্ময়ে দেখলাম, সাধু একজন লিঙ্গহীন পুরুষ ! লিঙ্গস্থানে একটি গোল দেড় ইঞ্চি ডায়মেটারের তামার পাত !! অথচ তাঁর অণ্ডকোষদ্বয় বর্তমান। আমার সঙ্গে সাধুর চোখাচোখি হলো। তিনি হাসলেন, কিন্তু আমি লজ্জা ও সংকোচবোধ করছিলাম। ভাবছিলাম, ঘর থেকে বেরিয়ে যাবো কী না।

কিন্তু সাধু সেই মুহূর্তেই আমার কৌতূহল ও বিস্ময়কে তুঙ্গে তুলে, লিঙ্গস্থান থেকে তামার পাতটি খুলে ফেললেন, আর যেন একটি ছিদ্রের ভিতর থেকে টেনে বের করলেন একটি শিথিল পুরুষ লিঙ্গ যা প্রায় মাটি স্পর্শ করলো। ব্যাপারটা সম্যক বুঝে ওঠার আগেই, তিনি তাঁর শিথিল লিঙ্গটি কয়েকবার নড়াচড়া করলেন, এবং জোরে নিশ্বাস টেনে দম বন্ধ করলেন। আমি তাঁর তলপেট কেঁপে উঠতে দেখলাম, এবং আরও দেখলাম লিঙ্গটি উচ্ছৃত ও শক্ত হয়ে উঠলো। এখন আর তাঁর হাত দিয়ে অঙ্গটি ধরা নেই। অথচ অঙ্গটি একবার ডাইনে ফিরলো, তারপরে বাঁয়ে, তারপরে উর্ধ্বে, তারপরে নিম্নে। এরকম কয়েকবার ডাইনে বাঁয়ে উর্ধ্বে নিম্নে চালিত হবার পরে, অঙ্গটি চক্রাকারে কয়েকবার পাক খেলো। এই সময়টা প্রায় দেড় মিনিট সাধু

বারেবারেই নিশ্বাস টেনে নিচ্ছিলেন, এবং আস্তে আস্তে নিশ্বাস ছাড়তে আরম্ভ করার পরে, অঙ্গটি পূর্বাবস্থা ফিরে পেলো। তখন তিনি তাঁর শিথিল অঙ্গটি আবার চেপে ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে, সেই তামার পাতটি জুড়ে দিলেন, এবং কৌপীন পরে, হেসে আমাকে হিন্দিতে জিজ্ঞেস করলেন, "দেখলে তো?"

দেখেছি নিঃসন্দেহেই, তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, তাই তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারিনি। সাধু তাঁর গেরুয়া কাপড়টি গায়ে চাপিয়ে হেসে বললেন, "বেটা, আমি তোমাকে যোগ দেখলাম তুমি আমাকে কিছু দর্শনী দাও।"

দর্শনী মানেই পয়সা, এবং তার জন্যও সেই মুহূর্তে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সেই বয়সে আমি বেকার ছিলাম। আমার পকেটে সামান্য পয়সা ছিল। আমি পকেট থেকে তাই নিয়ে সাধুকে দিলাম। সাধু আরও বেশি দর্শনীর আশা করে বলেছিলেন, "বাস, আর নেই?"

আমি বিনীতভাবে বলেছিলাম, "আর একটি পয়সাও নেই।"

আশাহত হলেও, সাধু হেসেই বলেছিলেন, "বহুত আচ্ছা, এতেই হবে। সাধু সজ্জনে ভক্তি আছে, তোমার এমন বন্ধুদেরই এ বিষয়ে বলো, অন্য কারোকে নয়।"

বাইরে বৃষ্টি তখনো ধরেনি, কিন্তু আমি ঘর থেকে বেরিয়ে ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরেছিলাম। সমস্ত দৃশ্যটা এমনই অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল, আর এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আমি আর কিছু ভাবতেই পারছিলাম না। ঘটনাটা বেশ কিছুদিন আমার মস্তিষ্কে বিঁধেছিল। সাধু কেন আমাকে "সাধু সজ্জনে বিশ্বাসী" ভেবেছিলেন, জানি না, কিন্তু আমি আমার কয়েকজন বন্ধুকে ঘটনাটা বলেছিলাম। জানি না, তারা কখনো সেই যোগ প্রত্যক্ষ করতে গিয়েছিল কী না। আমি তারপরেও অনেকবার 'সাধুঘাটে' গিয়েছি, কিন্তু সেই বিশেষ সাধুকে দেখলেই, অন্যদিকে সরে পড়তাম। এবং কিছুকালের মধ্যেই ব্যাপারটা ভুলে না গেলেও ও নিয়ে আর ভাবিনি।

কামাখ্যা পাহাড়ের সেই তান্ত্রিক সাধক, যাঁকে সবাই "প্রাণতোষবাবা" নামে উল্লেখ করতো তাঁর কাছে আমি সাধুর যোগ দেখানো ঘটনাটির কথা বলেছিলাম। প্রাণতোষবাবা আমাকে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মানুষের দ্বারা যে ওরকম অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রক্রিয়া সম্ভব, তাঁর ব্যাখ্যায় আমার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়েছিল। অবিশ্যি সম্ভব যে বটে, তা তো আমি নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। কিন্তু কী করে মানুষ এরকম অদ্ভুত ক্ষমতা আয়ত্ত করে, সেটাই আমি তাঁর কাছ থেকে কিছুটা বুঝে নিয়েছিলাম, এবং অবিশ্বাস করাও সম্ভব ছিল না।

প্রাণতোষবাবার যোগ বিষয়ে ব্যাখ্যার আগে, মাত্র বছরখানেক আগের আর একটি ঘটনার কথা আমি এখনই বলে নিতে চাই। কলকাতার থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরের শিল্পাঞ্চলে সেই অদ্ভুত ঘটনাটি আমি দেখেছিলাম। দিনটি ছিল শনিবার, চটকলের সাপ্তাহিক বেতন দিবস। গ্রীষ্মকালের বিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটা। ঘটনার স্থান একটি চটকলের কাছাকাছি। কিছু শ্রমিককে এক জায়গায় জড়ো হতে দেখে, আমিও কৌতূহলিত হয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, অনধিক তিরিশ বছর বয়সী একটি খালি গা যুবক ভিড়ের বেষ্টনীর মধ্যে দাঁড়িয়ে। কোমরে সামান্য একটি কাপড় জড়ানো। মেদবর্জিত শক্ত শরীর যুবকের মাথায় জটা, গায়ে ছাইভস্ম মাখা, মুখে কোঁকড়ানো গোঁফদাড়ি। কিন্তু কোনোরকম তিলক ত্রিপুণ্ড্র কিছুই আঁকা নেই। তার চোখ দুটো উজ্জ্বল, দৃষ্টি যেন অন্যমনস্ক আচ্ছন্ন। তার চোয়াল দুটো শক্ত। নাসারন্ধ্র স্ফীত। তার নাভিস্থল দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সে যেন নিশ্বাস ভিতরে টেনে নিয়ে একটা কোনো প্রক্রিয়া করছিল। তার হাত দুটোর পেশি শক্ত। এবং পাখির ডানার মতো খানিকটা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সে কোন কথাই বলছিল না।

সচরাচর কলকারখানার বেতন দিবসে নানা পেশার বিচিত্র সব

ভেকধারী লোকদের এসব অঞ্চলে দেখা যায়। টোটকা ওষুধ বা মন্ত্রসিদ্ধ মাদুলি তাবিজ ব্যবসায়ীদের কথা বলছি না। ধর্মীয় ভেকধারীর আরও নানা শ্রেণীকেই, বেতন দিবসে মধুলোভীর মতো এসব জায়গায় উপস্থিত হতে দেখা যায়। যুবকটিকে আমি সেইরকমই কিছু ভেবেছিলাম।

কিন্তু সচরাচর এ শ্রেণীর লোকেরা যা করে বা বলে থাকে, তার পরিবর্তে যুবকটি এক অদ্ভুত কাণ্ড করলো। সে সকলের সামনেই, তার কোমরের ছোট কাপড়ের টুকরোটি এক টানে খুলে নীচে ফেলে দিল। দেখলাম যথারীতি যৌনকেশ এবং অণ্ডকোষদ্বয় ছাড়া অস্বাভাবিক বৃহৎ আকারের একটি শিথিল লিঙ্গ। সে আরো সজোরে নিশ্বাস টেনে, দু হাতে তার অঙ্গটি মর্দন করতে লাগলো এবং সেটি যথেষ্ট শক্ত আর উচ্ছৃত না হলেও, আরও দীর্ঘতর হয়ে উঠলো। তারপরেই সে নীচু হয়ে, পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল এক কে. জি ওজনের বেশি একটি কংক্রিটের টুকরো। মনে হয় কংক্রিটের টুকরোটি আগে থেকেই যোগাড় করে রাখা হয়েছিল। সে তার সুবৃহৎ পুরুষাঙ্গের দ্বারা, অবিকল একটি মোটা দড়ির মতো সেই কংক্রিটের টুকরোটিকে এক পাকে বেঁধে, প্রায় পাঁচ থেকে সাত সেকেণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এই সময়টা সে নিশ্বাস বন্ধ করেছিল, আর তার সারা গায়ের পেশীগুলো যেন কাঁপছিল। তারপরেই কংক্রিটের টুকরোটা বন্ধনমুক্ত করে ফেলে দিল, এবং কাপড়ের টুকরোটি তুলে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলো। ইতিমধ্যে তার সারা গায়ে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়েছে, কিন্তু তার পেশির কম্পন স্থির হয়েছে।

সেই কয়েক মুহূর্ত সময়, আমিও নিশ্বাস বন্ধ করেই ছিলাম, অথবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যারা ভিড় করেছিল, তাদের চোখে মুখে আদৌ কোনো বিকারের লক্ষণ ছিল না। বরং তারা যেন অজাগতিক কিছু দর্শন করে সম্মোহিত হয়েছিল। তারপরেই সকলে সাধ্যমতো টাকা পয়সা সেই যুবকটির পায়ের কাছে ছুঁড়ে দিতে লাগলো। তখনই

লক্ষ করলাম। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন ছাইভস্ম মাখা জটাজুটধারী সাধু বেরিয়ে এসে টাকা পয়সাগুলো দু হাতে সংগ্রহ করলো, আর সবাইকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে উঠলো, "জয় বাবা মহাদেও কি জয়, জয় বাবা পশুপতিনাথ কি জয়।"···তারপরেই সে যুবকটির হাত ধরে দ্রুত ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল। পিছনের লোকেরাও তখন মহাদেবের জয়ধ্বনি করছে। আমি সাধু এবং যুবকটির অনুসরণ করলাম। দেখলাম, তারা রেলওয়ে স্টেশনেরদিকে যাচ্ছে। শিল্পাঞ্চলের রাস্তায় তখন যানবাহন আর মানুষের অত্যন্ত ভিড়। আমি দুজনের পিছনে পিছনে স্টেশনে এসে, তাদের হারিয়ে ফেললাম। সব কয়টি প্ল্যাটফরমে যাত্রীদের ভিড়ে ঘুরেও, তাদের দুজনকে আর দেখতে পেলাম না। বুঝতে পারলাম না, তারা আদৌ রেলওয়ে স্টেশনে ঢুকেছে কী না, অথবা অন্যদিকে চলে গিয়েছে।

তাদের দেখা পেলেও,আমার কোনো লাভ হতো কী না জানি না। তখন আমার একটাই আপসোস হচ্ছিল: একটা ফিলম্ ভরতি ক্যামেরার জন্য। একটা ক্যামেরা থাকলে, আমি যুবকের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপের ফটো তুলে রাখতে পারতাম। তবে আমি একেবারে আশা ছাড়িনি। শিল্পাঞ্চলের বন্ধুবান্ধবদের ঘটনাটা জানিয়ে,সেই যুবক ও সাধুর সন্ধান রাখতে বলেছিলাম। প্রায় মাসখানেক পরে খবর পেয়েছিলাম, সপ্তাহখানেক আগে, দুজনকে এক বেতন দিবসে টিটাগড়ে দেখা গিয়েছিল, এবং সেই একই প্রক্রিয়ার দ্বারা যুবকটি সমবেত দর্শকদের সম্মোহিত করে, টাকা সংগ্রহ করে চলে গিয়েছিল। আমি আর কখনো তার দেখা পাইনি।

যুবকটির সেই অস্বাভাবিক আকারের অঙ্গ এবং তার প্রক্রিয়া যে একটি যৌগিক ব্যাপার, তাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। অনেকটা সেই সাধুঘাটের সাধুর মতোই। তাই আমি খুব অবাক হইনি, কেন না কামাখ্যা পাহাড়ের প্রাণতোষবাবার যোগ বিষয়ের নানা ব্যাখ্যা আমার মনে ছিল। তা ছাড়া, আমার মতো অনেক

ভারতীয় নিশ্চয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, এমন কি বড় শহরেও দেখে থাকবেন, তথাকথিত যোগী সাধক, রাস্তার একপাশে মাটিতে গর্ত করে. গলাসহ গোটা মুণ্ড সেই গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে মাটি চাপা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে। দর্শকরা দেখে যাচ্ছে, আর যার যা সাধ্য মতো টাকা পয়সা তার চাপা দেওয়া মুণ্ডের কাছে রেখে যাচ্ছে।

এ সব ব্যাপারগুলো সহজ না মোটেই, যদিও যাদের কথা আমি বললাম, তাদের এক শ্রেণীর পেশাজীবী বলতে হবে। এই যোগের খেলা দেখাবার পিছনে নিশ্চয়ই তাদের অতীতের পরিশ্রম আছে। এদের সাধারণ ভিক্ষাজীবী কোনোরকমেই বলা যায় না। কিন্তু এরা কি উচ্চ মার্গের যোগ সাধক?

কখনোই না। প্রাণতোষবাবার ব্যাখ্যা থেকে যা বুঝেছি, তাতে বলা যায়, যারা পথে ঘাটে এই সব যোগের খেলা দেখিয়ে বেড়ায়, তারা এক সময়ে নিশ্চয়ই কঠিন যোগাভ্যাসে রত হয়েছিল। কিন্তু সিদ্ধিলাভের জন্য যতোদূর পৌঁছানো দরকার, ততোদূর পর্যন্ত তারা যেতে পারে নি। ক্ষমতার অভাবেই হোক, বা যে কোনো কারণেই হোক, তাদের পতন ঘটেছে। এক কথায় এদের বলা যায়, "যোগভ্রষ্ট"।

আমি যে-সব ঘটনার কথা বললাম, প্রাণতোষবাবার ব্যাখ্যানুযায়ী এসব হলো হঠযোগ। যোগীদের কল্পনায়, "হ" সূর্য "ঠ" চন্দ্র। কিংবা একটি প্রাণবায়ু, অপরটি অপানবায়ু। উভয়ের সংযোগে হঠযোগ। যে-কোনো সাধনার প্রধান হলো শরীর। শরীর সুস্থ সমর্থ না থাকলে, সবই ব্যর্থ। আর হঠযোগ শরীরকে সুস্থ, সবল, সুদৃঢ় করে। হঠযোগের সাধনা প্রধানতঃ স্থূল শরীরকে নিয়ে। গুরু তাঁর যোগী শিষ্যকে প্রথমে হঠযোগের শিক্ষাই দেন।

এই স্থূল শরীরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হলে, সূক্ষ্ম শরীরের ও মানস ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ হতে পারে।

প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "তুমি যে সাধুর কথা বললে, সে স্থূল

শরীরের সাধনায় অনেকটা সিদ্ধিলাভ করেছিল। অর্থাৎ হঠযোগের সাধনায় অনেকখানি এগিয়েছিল। তারপরে আর এগোতে পারে নি। ফলে ম্যাজিকের মতো ওই সব অঙ্গের প্রক্রিয়া দেখিয়ে বেচারীকে এখন উপার্জনের ফিকির করতে হচ্ছে। কিন্তু এটা তো সহজেই অনুমান করা যায়, এ সব লোককে এক সময়ে কঠিন প্রাণায়াম অভ্যাস করতে হয়েছে, অর্থাৎ পূরক রেচক আর কুম্ভক। এই প্রাণায়ামের দ্বারাই কুণ্ডলিনীকে জাগানো সম্ভব। আর কুণ্ডলিনী জেগে উঠলেই সুষম্না নাভির বন্ধ দরজা খুলে যায়। যেটা আমাদের সাধনার সিদ্ধি-লাভের একমাত্র পথ। এসব ম্যাজিক দেখানো যোগীরা নিশ্চয়ই সুষুম্নার বন্ধ দরজার খিল পর্যন্ত খুলতে পেরেছিল, তারপরে আর তাকে আরোও ওপরে তুলে নিয়ে যেতে পারে নি। স্থূল আর সূক্ষ্ম শরীরের যোগ সাধনার, সেখানেই সংকট। কিন্তু যোগের ওই দুই সিদ্ধি না হলে, কোনো সাধনাই সম্ভব না, আর তার জন্য এই শরীরই আমাদের একমাত্র সম্বল। 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।' শরীরই আদি ধর্মসাধন।"

এ কথা আমি আগেই বলেছি, তন্ত্র—তা হিন্দু বৌদ্ধ সহজিয়া, যে-মতেই হোক, যোগ সাধনা তার প্রথম ধাপ, এবং মানুষের শরীরই তার একমাত্র সম্বল। দেহের সাধনাই তন্ত্র সাধনা, দেহ ছাড়া এ সাধনা সম্ভব না, এবং তা নর নারীর মিলিত দেহ সাধনা। এ কথা আমাকে প্রাণতোষবাবাই বিশদ বুঝিয়ে বলেছিলেন, এ তত্ত্ব সাধতে হলে, যোগের দ্বারা দেহ শোধন প্রাথমিক। সেইজন্যই আমি প্রাণতোষবাবার যোগের ব্যাখ্যাটা সেরে নিতে চাই। তা হলে মূল বিষয়ে প্রবেশের অনেক সুবিধা হবে।

১৯৪৭-এর নভেম্বরের কামাখ্যায় যাবার আগে, ১৯৪৬-এ কালীপূজা উপলক্ষে আমি বীরভূমের এক গ্রামে গিয়েছিলাম। বীরভূমের সাঁওতাল পরগনার সীমান্তে প্রায় একটি বিচ্ছিন্ন বাঙালী গ্রাম এবং গোটা গ্রামটাই ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত, কিছু সাঁওতাল এবং

অন্ত্যজশ্রেণীর কৃষিকাজের লোক ছাড়া। সাঁওতাল পরগণার সীমান্তে এরকম একটি সম্পন্ন বাঙালী ব্রাহ্মণদের গ্রাম গড়ে ওঠার পিছনে কয়েকশো বছরের পুরনো ইতিহাস আর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এ ক্ষেত্রে তা নিয়ে আলোচনার কোনো দরকার নেই। গ্রামটির অধিকাংশ প্রজাই সাঁওতালি।

আমার থেকে সামান্য কয়েক বছরের বড় এক যুবকের বাড়ি সেই গ্রামে। তার সঙ্গে বন্ধুত্ব সূত্রেই আমি জানতে পারি, সেই গ্রামের কালীপূজা বহুকালের প্রাচীন, এবং তন্ত্র মতে সেই পূজা হয়। বাদশাহী আমলে রাজা উপাধিপ্রাপ্ত ছয়টি পরিবারে ছয়টি কালীপূজা হয়। সকলেই শাক্ত ধর্মাবলম্বী। আমার যুবক বন্ধুটিও এরকম একটি পরিবারের সন্তান। কিন্তু তন্ত্র মতে কালীপূজা কী রকম, সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না, বা সেই গ্রামে গিয়ে পূজা দেখে আমি কিছু বুঝতেও পারিনি। বৈশিষ্ট্য বোঝবার জন্য আমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে নিজে ছেলেবেলা থেকেই শহরবাসী, বামপন্থী রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। ওসবে তার কোনো কৌতূহল বা আগ্রহ ছিল না। সে আমাকে তাদের পরিবারের একজন অভিজ্ঞ শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

তন্ত্রমতে পূজা কী, আমার এই জিজ্ঞাসার জবাবে, সেই শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ ব্যক্তি বলেছিলেন, "বিষয়টি তোমার পক্ষে সহজে বোঝবার নয়।" বলে তিনি আমাকে কালী প্রতিমার পিছনে, চালচিত্রের বাঁ দিকে দেখিয়ে বলেছিলেন, "ওই যে দশটি কাগজের চৌকো টুকরো লম্বা হয়ে ঝুলছে, তার একেবারে নীচেরটি লক্ষ কর, আর বাকি গুলোও দেখ।"

আমি দেখেছিলাম, অনেকটা তুলোট কাগজের মতো সেই দশটি চৌকো টুকরো চালচিত্রের সঙ্গে ঝোলানো। প্রত্যেকটি টুকরোই আলাদা, একটার সঙ্গে আর একটা সুতো দিয়ে গ্রথিত। একেবারে নীচের কাগজটিতে অদ্ভুত কতগুলো রেখাচিত্র আঁকা। মাঝখানে

ত্রিকোণ মধ্যে একটি লাল গোল বিন্দু। বাকি নয়টির সবগুলোতেই একটি করে পদ্মফুল আঁকা। শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বলেছিলেন, "একেবারে নীচে যেটি দেখছো, এটিকে বলে শ্রীযন্ত্র। ওটিকে তুমি ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ বলতে পারো, অথবা মানবদেহও ভাবতে পারো। আর যে নয়টি পদ্ম দেখছো, ওগুলো বিভিন্ন নামে মূলাধার—অর্থাৎ মানুষের শরীরের লিঙ্গমূলের নীচে, অকুল বা কুলস্থান থেকে ওপরের দিকে উঠেছে। যথা ঃ অকুল, কুল, মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, তালু ( গলার ), ভ্রূমধ্য। কিছু বুঝলে ?"

আমি সবিনয়ে বলেছিলাম, "আজ্ঞে না।"

বৃদ্ধ হেসেছিলেন, বলেছিলেন, "আমি তো আগেই বলেছি, সহজে এসব বোঝবার নয়। বোঝানো যায়ও না। এক মাত্র সাধক গুরুরাই এসব বুঝতে পারেন, তাঁদের শিষ্যদের শেখাতে পারেন। তোমার আমার কারোরই সে অধিকার নেই। তবে এই যন্ত্র ছাড়া, আমাদের পূজা যে তন্ত্রমতে হয়, তার আর একটি হলো, পঞ্চতত্ব দ্বারা এই পূজা হয়। পঞ্চতত্ব হলো, মদ, মাংস, মাছ, মুদ্রা, মৈথুন। এখন তুমি যদি ভাবো, পূজায় বাস্তবে সবই ব্যবহার করা হচ্ছে, তা হলে ভুল হবে। মদ অবিশ্যিই রয়েছে, কিন্তু বলির আগে মাংসের অনুকল্প হলো লবণ আদা জাফরান তিল গম মাষকলাই আর রসুন। সিদ্ধি আর ছোলা বেটে মাছের আকারের বড়া হলো মৎস্য, মুদ্রা হলো ঘিয়ে ভাজা অন্ন। এর পরে মৈথুন। রক্তকরবী ফুল হলো লিঙ্গ পুষ্প, নীল অপরাজিতা যোনিপুষ্প। দুইয়ের মিলনে মৈথুন, আর এক্ষেত্রে চন্দনকে বীর্য আর কুঙ্কুমকে রজঃ রূপে মেলাতে হবে। এইভাবে মৈথুন ভাবনা করে দেবীকে পূজা দেওয়া হবে। এই হলো তন্ত্রমতে পূজা। কিছু বুঝলে ?"

আমি বলেছিলাম, "একটা অস্পষ্ট ধারণা হলো।"

বৃদ্ধ বলেছিলেন, তার বেশি কিছু সম্ভব নয়। একজন তান্ত্রিক সাধক পূজা করলে, তার রূপ একরকম। এ হলো গৃহের তন্ত্র মতে

পূজা। প্রতীক আর অনুকল্প দিয়ে এখানে পূজা হয়। এর বেশি বোঝানো সম্ভব নয়।"

প্রকৃতপক্ষে পূজা দেখার উপলক্ষে এত জটিল বিষয় জানবার মতো মানসিক অবস্থা আমারও ছিল না। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার প্রাকৃতিক চেহারার উঁচু নীচু লাল মাটির সেই গ্রামটিকে আমার ভালো লেগেছিল। কোনো একটি গ্রামে এমন শতাধিক শিবমন্দির আমি আর কোথাও আগে দেখিনি। এবং প্রায় প্রত্যেকটি মন্দিরেই পোড়া ইঁটের কারুকার্য ছিল। সেই হিসাবে আমার ধারণায় গ্রামটিকে তো শৈব গ্রামই বলা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু আমি প্রথম থেকেই শুনেছি, গ্রামটি ঘোর শাক্তদের অর্থাৎ শক্তি পূজারীদের। অবিশ্যি গ্রামের প্রান্তে একটি ছোট নদীতীরে এক শক্তি দেবীর মন্দির আছে। দেবীর নাম মৌলীক্ষা।

যতোই অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, ততোই যেন গ্রামটার চেহারা বদলিয়ে যাচ্ছিল। আমি গ্রামে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম, বিশেষ করে পূজাবাড়িগুলোর পূজামণ্ডপের প্রাঙ্গণে শত শত সাঁওতাল পুরুষ রমণীরা এসে জড়ো হচ্ছিল। তাদের প্রায় সকলের সঙ্গেই একটি করে পাঁঠা। পাঁঠা ছাড়াও, প্রত্যেক পূজা বাড়িতেই একটি করে মাঝারি গঠনের মোষের যাঁড় বাঁধা ছিল। প্রত্যেক প্রাঙ্গণেই এক বা একাধিক পশুবলির জন্য সাময়িক যূপকাষ্ঠ স্থাপিত ছিল।

আমার মনে হয়েছিল, রাত্রে কেউ ঘুমোতে যায়নি। মহানিশা-যোগে পূজা যতোই শেষ হয়ে আসছিল, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সাঁওতাল সকলেই মদ্যপানে উল্লসিত হয়ে উঠছিল। রমণীরাও বাদ যাচ্ছিল না। এমন কি, মাঝে মাঝে মোষগুলোকেও মদ্য পান করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। আর হঠাৎ হঠাৎ দেবীর জয়ধ্বনিতে ঢাকের বাজনায়, বা ফুলঝুরির আলোয় পশুগুলো রক্ত চোখে দাপাদাপি করছিল। বাঁধন ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছিল।

অমাবস্যার নিকষ কালো রাত্রে, পূজামণ্ডপে এবং অন্যান্য বাড়ির

আলোগুলোকে দেখাচ্ছিল রক্তিম। নরনারীদের ছায়াগুলো কম্পিত। আসন্ন বলির প্রতীক্ষায় পশুগুলো আর্তনাদ করছিল। তার মধ্যেই নরনারীর হাসি উল্লাস ও মাতন। কালী প্রতিমার আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু যেন অপলক চোখে সবই দেখছেন। আমার চোখে সমস্ত পরিবেশটা যেন কোনো এক আদিম উৎসবের মতো মনে হচ্ছিল।

মহানিশায় কালী পূজা অন্তেঃ, শেষ রাত্রে বলি শুরু হয়েছিল। তখন চারদিকে কেবল রক্তের বন্যা। ছিন্ন মুণ্ড বলির পশুগুলো নিয়ে, সকলেই লোফালোফি করছিল। কপালে রক্তের ফোঁটা মাখাচ্ছিল। বিশেষ করে মহিষের রক্তের ফোঁটা কপালে লাগাবার জন্য সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। রক্তের জোয়ার যেন সবাইকে একটা নতুন উন্মাদনা দিয়েছিল। কখন সকাল হয়ে গেল, দিনের আলো ফুটলো, রোদ উঠলো, কিছুই টের পেলাম না। অনেক বেলা পর্যন্ত চলেছিল বলির পর্ব। কম করে হলেও পাঁচশো পাঁঠা নিশ্চয়ই বলি হয়েছিল। গ্রামের লাল মাটির পথে পথে মাটি রঙের থেকেও গাঢ় রক্তের দাগ।

কিন্তু এসবের মধ্যেই আমার বন্ধু আমাকে বাড়ির ভিতর নিয়ে গিয়েছে। আমি স্নান করেছি, খেয়েছি, কিন্তু সবই যেন একটা ঘোরের মধ্যে। সাঁওতাল রমণী পুরুষরা ক্রমেই সুরাপানে মত্ত হয়ে উঠছিল, আর গ্রামের পথে পথে, পূজাবাড়িগুলোর মণ্ডপ প্রাঙ্গণে, এমন কি ভিতর বাড়ির উঠোনেও মাদল বাজিয়ে নেচে গান গাইতে আরম্ভ করেছিল। আমি তাদের গানের ভাষা বুঝতে পারছিলাম না। তারা যে আদিম উল্লাসে মত্ত, এবং নাচের ছন্দ ভেঙে মেয়ে পুরুষ জড়াজড়ি করছিল, তা দেখতে পাচ্ছিলাম।

বেলা পড়ে আসতেই, সমস্ত কালী প্রতিমাগুলো বিসর্জনের জন্য, নদীর ধারে মৌলীক্ষা দেবীর মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, এবং ঢাকের বাজনার তালে তালে প্রতিমা নিয়ে সারা মাঠে ঘুরে ঘুরে নাচ চলছিল। তার মধ্যেই মাঠ জুড়ে সহস্রাধিক সাঁওতাল রমণী পুরুষের নাচ গান

চলছিল। তারপরেই একটা অভাবিত দৃশ্য আমার চোখে পড়েছিল। দেখেছিলাম সাঁওতাল রমণী পুরুষরা জোড়ায় জোড়ায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে মৈথুন ক্রিয়ায় রত। অবিশ্বাস্য মনে হলেও আমার চোখের সামনে আমি এক গণ-মৈথুনের জীবন্ত চিত্র দেখছিলাম। অন্ধকার নামার সঙ্গে এ ঘটনা যেন তাদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছিল।

আমি জানি না, মহাশক্তির পূজা, বলি, রক্ত, তন্ত্র আর সেই গণ-মৈথুনের সঙ্গে আদিম কালের উর্বরাশক্তি বিশ্বাসের কোনো যোগাযোগ ছিল কী না। সেই ভাবে স্বাধীন বাছাই করা জুটির সঙ্গে পরস্পরের মিলনের পরিণতি সম্পর্কে আমার বন্ধু জানিয়েছিল, সাঁওতালদের গাঁও বুড়া বা নেতৃস্থানীয় লোকেরা নাকি সকলের প্রতিই নজর রেখেছিল এবং অবিবাহিত জুটিদের মধ্যে ভবিষ্যতে বিয়ে হবে। কিন্তু বিবাহিত নরনারীদের কী গতি? তারা তো স্বামী স্ত্রী বেছে একত্রে কিছু করেনি। সেই উদ্দাম উন্মত্ত পরিবেশে তা সম্ভবও ছিল না।

তার কোনো জবাব আমি পাইনি। কামাখ্যার প্রাণতোষ-বাবাকে আমি উক্ত ঘটনা বলেছিলাম। জবাবে উনি বলেছিলেন, "মৈথুনকে আমরা বলি পঞ্চমতত্ত্ব, তার সঙ্গে যোগ সাধনা আছে। বীরভূমের সেই অঞ্চলের সাঁওতালরা হয় তো তাদের বিশেষ কোনো অনুষ্ঠানের দিন হিসাবে কালীপূজার বিসর্জনের দিনটিকে বেছে নিয়েছে। আমি শুনেছি বছরে কোনো একটা বিশেষ দিনে ভারতের আদি-বাসীদের মধ্যে এরকম একটি প্রথা প্রচলিত আছে। এর সঙ্গে ফার্টিলিটি কাল্টের যোগাযোগ থাকতেই পারে। তন্ত্র সাধনার মূলে এর কোনো যোগাযোগ ছিল না, তাও বলা যায় না। তন্ত্র সাধনা মূলতঃ শক্তি সাধনা। শক্তি হলো নারী। শক্তিহীন শিব শব মাত্র। শক্তির সংস্পর্শে এলেই শিব জেগে ওঠেন, অর্থাৎ পুরুষ জেগে ওঠে। যে গ্রামে তন্ত্রমতে এরকম বিরাট পূজার প্রচলন, সেখানে পঞ্চম তত্ত্বের বাড়াবাড়ি হতেই পারে। তবে হয়তো তুমি সাঁওতালদের সহজ ও লীল ক্রিয়া দেখেছো অন্যাদের দেখবার সুযোগ পাওনি। তুমি তো

আর ঘরে ঘরে ঘুরে দেখিনি। তবে আমি জানি পশ্চিমবঙ্গে বীরভূম বা রাঢ় অঞ্চলেই এখনো তন্ত্র সাধনার কিছু অবশিষ্ট আছে।"

তাঁর কথার সত্য প্রমাণ আমি পরে পেয়েছিলাম। যাই হোক, ১৯৫৫-তে আমি আবার বীরভূমের সেই গ্রামের কালীপূজো উপলক্ষে গিয়েছিলাম। সেবার আমি একটি ক্যামেরাও নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সাঁওতালদের ভিড় কিছু কম দেখেছিলাম এবং তাদের নাচ গান উল্লাসের সময়, হঠাৎ এক ডজন সাইকেলে চেপে, ট্রাউজার শার্ট পরে প্রায় দু'ডজন সাঁওতাল যুবক এসে তাদের ঘিরে রেখেছিল। তাদের মধ্যে একজন আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল, কোনোরকম ফটো তোলাই চলবে না। আমি বুঝেছিলাম, কালের স্রোতে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে। সেই যুবকদের সকলের গলায় ক্রস চিহ্ন ঝুলছিল। তারা এসেছিল দুমকা থেকে।

এই প্রসঙ্গেই, এ বছরের কালীপূজায় আমার আর একটি অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চাই। এবছর কালীপূজায় আমি পুরুলিয়ার এক দূর গ্রামে গিয়েছিলাম। গ্রামটিকে দেখে, আমার বীরভূমের সেই গ্রামটির কথাই বিশেষ করে মনে পড়ে যাচ্ছিল। গ্রামটি থেকে পাঁচ মাইল দূরেই বিহার সীমান্ত, এবং গ্রামটি একটি বিচ্ছিন্ন বাঙালী ব্রাহ্মণদের গ্রাম, সকলেই ঘোর শাক্ত, শক্তির উপাসক। তার সত্যতার প্রমাণ পেলাম, কালী মন্দিরের সামনে পূজো শেষে বলির প্রাবল্য দেখে। সেই তুলনায় বীরভূমের গ্রাম কিছুই না। এই গ্রামের দু একজন বয়োজ্যেষ্ঠের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, এক তান্ত্রিক সাধক গ্রামে কালী প্রতিষ্ঠা করেন, এবং তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে তন্ত্রমতে সাধনা করতেন। আরও জানলাম, পূজার ঘট যেখানে স্থাপিত, তার নীচেই রয়েছে পাথরে খোদাই করা শ্রীযন্ত্র। রাত্রি বারোটা থেকে পাঁঠা ও মহিষ বলি শুরু হলেও পরের দিন দুপুর গড়িয়ে যাবার পরেও বলি শেষ হয়নি। শুনলাম বিকাল পর্যন্ত চলবে।

আমার পক্ষে বলির সংখ্যা হিসাব করে বলা কঠিন। সহস্রাধিক

তো বটেই এবং ডজন খানেক মহিষ। এই প্রথম দেখলাম, বিশেষ ভাবে তৈরি যূপকাষ্ঠ, যার ভিতরে এক সঙ্গে চারটি পাঁঠার মুণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে, খাঁড়ার এক কোপে চারটি বলি। যারা বলি দিচ্ছিল তাদের কবজির জোর আর খাঁড়ার ওজনটি ভাববার মতো। রক্ত ছিটকে উঠছিল, আর দুটি যূপকাষ্ঠের সামনে পায়ের পাতা ডুবে যাবার মতো রক্ত জমে উঠেছিল। যারা বলি দিচ্ছিল এবং আশেপাশে ছিল, তাদের সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ। তাদের চোখগুলো ছিল সুরাপানে আরক্ত। মনে হচ্ছিল তারা যেন এক ধরনের উল্লসিত খুনের নেশার মেতে উঠেছে।

তন্ত্রে পশু বলি এবং রক্ত একটা আবশ্যিক বিষয়। তা ছাড়াও তন্ত্র সাধনায় রক্তের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সে রক্তের নাম তখন "রজঃ" হয়ে যায়। আরো নানাবিধ সাংকেতিক নামেও সেই রজঃ-এর উল্লেখ আছে। বলাবাহুল্য ঋতুমতী নারীই সেই রজঃ-এর উৎস।

ফিরে যাওয়া যাক যোগ সাধানার বিষয়ে। যোগ কী, এবং তন্ত্র সাধনায় তার কী প্রয়োজন, এটা না জানলে, তন্ত্রের মর্ম সঠিক অনুধাবন করা যায় না। অবিশ্যি, এ বিষয়ে আমি তত্ত্বজ্ঞ নই। আমাকে কামাখ্যা পাহাড়ের প্রাণতোষবাবা যা বুঝিয়েছিলেন, তার সবখানি বুঝেছিলাম, তাও ঠিক বলা যায় না। কারণ আমি সাধক নই, বা তাঁর শিষ্যও ছিলাম না। নিতান্ত একজন জিজ্ঞাসু যুবককে যতোখানি বোঝানো যায়, তিনি সেই ভাবেই আমাকে বুঝিয়েছিলেন। বোঝাবার জন্য তিনি আমার শরীরে নানা অঙ্গে যে-ভাবে হাত দিচ্ছিলেন, আমি রীতিমতো অস্বস্তি আর সংকোচ বোধ করেছিলাম। তিনি তা বুঝতে পেরে আমাকে ধমক দিয়ে স্থির হতে বলেছিলেন।

প্রাণতোষবাবার যোগ বিষয়ে ব্যাখ্যার আগেই, কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রথমতঃ ১৯৪৮-এর নভেম্বরে আমার গন্তব্য ছিল

গৌহাটি, কামাখ্যা না। দ্বিতীয়তঃ গৌহাটি যাবার পথে, ট্রেনের কামরায়, প্রাণতোষবাবার সাধন সঙ্গিনী ভৈরবী, যাঁকে সবাই "পবিত্রী মা" নামে জানে, এবং তাঁর আর এক সঙ্গিনী এক কুমারী সাধিকা, যাঁর কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি, দুজনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। এই দ্বিতীয় ঘটনারই পরিণতি কামাখ্যা পাহাড়ে গমন, এবং প্রাণতোষবাবার দর্শন। পবিত্রী মা আমাকে কামাখ্যায় তাঁদের আশ্রমে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, পবিত্রী মাকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। স্বীকার করতেই হবে, সেই মুগ্ধতার মধ্যে কোনো ধর্ম বোধ ছিল না। একান্তই মানবিক। যদিও লাল চওড়া পাড়ের গেরুয়া রেশমের শাড়ি ও জামা তাঁর গায়ে ছিল, রুদ্রাক্ষ প্রবাল ঠুমরা ইত্যাদির মালা ও তাগা ছিল, কিন্তু আমার চোখে তিনি প্রথম দর্শনে ছিলেন ত্রিশ বছর বয়সের এক সুন্দরী রমণী। মধুরহাসিনী, বাকপটিয়সী, তাম্বুলরঞ্জিত বিম্বোষ্ঠা, এবং তাঁর গা থেকে একটি মিষ্টি সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। আমি তাঁর বিপরীত দিকের আসনের যাত্রী ছিলাম। তিনি খুব সহজেই আমার নাম ধাম পরিচয় জেনে নিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছিলেন। কোনো রকম ধর্মীয় আবরণ না রেখেই, তিনি আমার সঙ্গে নানা কথা বলেছিলেন, আর তার মধ্যেই ছোটোখাটো পরিহাস করে, এক এক সময় প্রায় বালিকার মতোই খিলখিল করে হেসে উঠেছিলেন।

পবিত্রী মায়ের সঙ্গিনীটির বয়স কুড়ির কিছু বেশি হতে পারে। পবিত্রীমায়ের কপালে বিভূতি ছাড়াও, ভ্রূজোড়ার মাঝখানে সিন্দুরের ফোঁটা ছিল, চুলের সিঁথায়ও সিন্দুরের রেখা ছিল। সঙ্গিনীটির তা ছিল না বলেই তাঁকে আমি কুমারী ভেবে নিয়েছিলাম। পরে জেনেছিলাম আমি ঠিকই ভেবেছিলাম। উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী সেই তরুণীরও গায়ে গেরুয়া রঙের লাল পাড় শাড়ি ছিল। সেও সুন্দরী, কিন্তু গম্ভীর থাকবার চেষ্টা করছিল। যদিও তার গাম্ভীর্যের মেঘ ফুঁড়ে বিদ্যুৎচমকের মতোই মাঝে মাঝে মুখে হাসি ফুটছিল। ট্রেনের কামরায় তিনি

আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। অল্প দু একটি কথা পবিত্রী মায়ের সঙ্গে বলেছিলেন, তাঁর পান সেজে দিয়েছিলেন এবং তাঁর কথা শুনেই মাঝে মাঝে তিনি হাসি সংবরণ করতে পারেননি। পবিত্রী মা কুমারীকে "জগত" নামে সম্বোধন করছিলেন।

ট্রেনের কামরার কথাবার্তার মধ্যে আমি পবিত্রীমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী তাঁর পরিচয়। অবিশ্যি কথাটা আমি ভয়ে ভয়েই জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিলেন, "আমি ব্রহ্মাণ্ড।"...স্বভাবতই আমি অবাক হয়েছিলাম। একজন সাধিকার পরিচয় "ব্রহ্মাণ্ড" কী করে হয়? তিনি আবার বলেছিলেন, "আমিই শিব।"...তাই বা তিনি কী করে হতে পারেন? শিব তো পুরুষ। তিনি আবার বলেছিলেন, "আমি শক্তি।"

বলাবাহুল্য আমি তাঁর সম্যক পরিচয় কিছুই বুঝতে পারিনি। কথাগুলো বলবার সময় তিনি তাঁর আয়ত চোখে অপলক স্থির দৃষ্টিতে আমার চোখের দিকে তাকিয়েছিলেন। তখন তাঁকে মানবীর তুলনায় প্রতিমার মতোই মনে হয়েছিল। আমি মনে মনে অস্বস্তিবোধ করেছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কিছু বুঝলে?"

"না।" আমি জবাব দিয়েছিলাম।

পবিত্রী মা হেসেছিলেন, এবং আবার আগের মতোই পরিহাস-পরায়ণা স্বাভাবিক রমণী হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেননি। তারপরে এক সময়ে আমিই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনাদের ধর্ম সাধন বিষয়ে আমাকে কিছু বলবেন?"

"কেন? কোন্ অধিকারে তুমি তা জানতে চাও?" পবিত্রীমা যেন সহসাই দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরেছিলাম, আমি আমার সীমা অতিক্রম করেছি। অপ্রস্তুত লজ্জায় বলেছিলাম, "মাফ করবেন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।"

পবিত্রীমা যেমন দপ্ করে জ্বলে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনিই সহসা

তাঁর মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। জানি না, তিনি কী ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, "তুমি কামাখ্যায় আমাদের আশ্রমে এসো। তোমার যদি কিছু জানবার থাকে, বাবার কাছ থেকে জানতে পারবে।"

প্রাণতোষবাবার সান্নিধ্যে আসার এই হচ্ছে পশ্চাৎকাহিনী। যদিও প্রাণতোষবাবাকে সামনে দেখে, আমি বেশ ভয়ই পেয়েছিলাম। মেদবর্জিত দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ শ্যামবর্ণ, কিন্তু তাঁর বক্ষস্থল, দুই গাল এবং দুই চক্ষুই রক্তবর্ণ। গোঁফদাড়ি কামানো মুখ হলেও, তাঁর মাথায় সাপের মতো বিড়ে পাকানো জটা। গলায় ও হাতে রুদ্রাক্ষের মালা ও তাগা। নভেম্বরের মাঝামাঝি পাহাড়ি শীতেও তাঁর খালি গা, কটিতে জড়ানো ছিল একফালি গেরুয়া বস্ত্র। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব ছিল। পবিত্রীমা পরিচয় করিয়ে দেবার পরে, তিনি প্রথমেই বলেছিলেন, "তুই আমাদের সাধন বিষয়ে জানতে চেয়েছিস? আয়, তার আগে তোকে আমি একবার দেখে নিই।" বলেই তিনি আমাকে একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, এক মুহূর্তও সময় না দিয়ে, হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন আমার নিম্নাঙ্গে। আমার বাধা দেবার সাহস ছিল না, কিন্তু আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম।

প্রাণতোষবাবা একটুও না থেমে, আমার পায়ুস্থান ও লিঙ্গমূলির মাঝখানে হাত রেখেছিলেন। আঙুল দিয়ে টিপে টিপে, পায়ুস্থানের থেকে শিরদাঁড়ার মূল পর্যন্ত দেখে, প্রায় দুর্বোধ্য ভাষায় পবিত্রীমাকে বলেছিলেন, "মা, এ ব্যাটার ক্ষমতা আছে, চেষ্টা করলে লড়ে যেতে পারবে। তবে দমের ঘরটা বিশেষ ভালো না। কাসিতে বারো মাস ভোগে, ধূমপানও বেশি করে।"

আমি তখন আকস্মিক ঘটনার বিস্ময়ে ও লজ্জায় এতটুকু হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু শরীরের মাত্র বিশেষ একটি জায়গায় আঙুল দিয়ে স্পর্শ করে, কী করে তিনি আমার অতিরিক্ত ধূমপান আর কাসিতে ভোগার কথা বলেছিলেন, জানি না। আমার অভিজ্ঞতায়,

ওটা তো বরাবর ডাক্তারের স্টেথসকোপেই ধরা পড়ে। প্রাণতোষবাবা আমাকে বলেছিলেন, "তুই আমার এখানে কয়েকদিন থাক, পরে তোর সঙ্গে আমি কথা বলবো।"

কয়েকদিন বলতে বেশ কিছুদিন আমি সেই আশ্রমে ছিলাম, এবং সেই দিনগুলোতে আমি পবিত্রী মা, জগত যোগিনী আর প্রাণতোষবাবার স্নেহ ও প্রীতি লাভে বেশ ভালো ছিলাম। প্রাণতোষবাবা আমার পারিবারিক পরিচয় জেনেছিলেন, এবং আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যোগ বিষয়ে আমি কখনো, আমার বাবার গুরুর কোনো মহিমা দেখেছি কী না। বলাবাহুল্য, আমি দেখিনি, কিন্তু সাধুঘাটের সেই সাধুর কথা তাঁকে বলেছিলাম। শুনে তিনি হেসে বলেছিলেন, "ও তো একরকমের নাড়ি আর পেশির খেলা। তবে যোগাভ্যাস ছাড়া ওসব হয় না। কিন্তু ও বেচারি সাধু যোগ সাধনায় বেশিদূর যেতে পারেনি। আমি একজন তান্ত্রিক সাধক, বা বলতে পারিস কুলাচারী বীর সাধক। যোগ সাধনা না হলে, তন্ত্র সাধন কখনোই সম্ভব না। তুই কি যোগ বিষয়ে কিছু জানিস?"

"আজ্ঞে না, কিছুই জানি না।"

"অবিশ্যি তোর পক্ষে জানা সম্ভবও না। এসব একমাত্র গুরুর কাছেই জানতে আর শিখতে হয়। তোর যদি ইচ্ছা থাকে, তোকে একটা মোটামুটি ধারণা আমি দিতে পারি। তার বেশি কিছু পারি না। কারণ আমি তোর গুরু নই, তুইও সাধক নোস। আমরা কেউ অনধিকার চর্চা করতে পারি না।"

আমি বলেছিলাম, "আপনি একটা ধারণা দিলেই আমি কৃতার্থ হবো।"

আশ্রম সীমানার পাহাড়ি ঢালুতে প্রাণতোষবাবার নিজস্ব একটি ঘর ছিল। সেখানে এক ধারে একটি ত্রিশূল পোঁতা ছিল। ত্রিশূলের সামনে, পাষাণের মেঝেয় একটি দুর্বোধ্য আঁকাজোকা যন্ত্র বিশেষ, যা আমি বীরভূমের গ্রামে কালী প্রতিমার চালচিত্রে তুলোট কাগজে

দেখেছিলাম। সেই ঘরে ছয়টি নরকরোটিও, একপাশে লাল কাপড়ের ওপর রক্ষিত ছিল। প্রাণতোষবাবা আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে বলেছিলেন। নিজেও দরজা বন্ধ করে. গুলবাঘের চামড়ার ওপরে বসেছিলেন। বলেছিলেন, "আমরা আমাদের শরীরকে বলি ভাণ্ড বা পিণ্ড। বিশ্বাস করি, এই ভাণ্ডে যা আছে, তা ব্রহ্মাণ্ডেও আছে। তাই এই শরীরকেই আমরা মনে করি আদি ধর্মসাধন। শরীরকে সাধন উপযোগী করতে হলে, এটিকে সুস্থ শক্ত দৃঢ় রাখতে হবে, আর যোগ সাধনের দ্বারা একে প্রস্তুত করতে হবে। কী করে? প্রাথমিক হলো আসন আর ব্যায়াম। এর সঙ্গে সঙ্গেই, গুরুর কাছে শিখতে হয় প্রাণায়াম। প্রাণায়াম তিন রকম, রেচক, পূরক, কুম্ভক। এতে নাড়ি শুদ্ধি হয়। আমাদের শরীরের মধ্যে অসংখ্য নাড়ি আছে, তার মধ্য দিয়ে বায়ু চলাচল করে। প্রাণায়ামের দ্বারা বায়ুর ঘর পরিষ্কার করতে হয়। কিন্তু কেন?"

প্রাণতোষবাবা প্রশ্ন করে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম, "জানি না।"

"বেশ, তুই কাপড় খুলে, উলঙ্গ হয়ে আমার সামনে দাঁড়া।" তিনি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

আমি উঠে দাঁড়িয়েও, কাপড় খুলে উলঙ্গ হতে সংকোচ বোধ করছিলাম। তিনি নিজেই আমার কাপড় খুলে দিতে দিতে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, "আমার সামনে তোর লজ্জার কী আছে? দু পা ফাঁক করে দাঁড়া।"

আমি উলঙ্গাবস্থায় তাঁর নির্দেশমতো দু পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "ময়না তদন্তে আমাদের প্রাণময় কোষ ছাড়াও, মনোময় কোষেরও কিছু কিছু আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সব আবিষ্কার সম্ভব হয়নি। আমার বিশ্বাস, ভবিষ্যতে একদিন হবে। যেমন, ইড়া, পিঙ্গলা বা সুষুম্না। এই নাড়িগুলো ময়না তদন্তে এখনো ধরা পড়ে না। জীবন্ত মানুষকে কেটে দেখলে কি হতো জানি না,

কিন্তু এই নাড়িগুলো বাস্তবে আছে, একমাত্র সাধনার দ্বারা তা অনুভব করা যায়।"

প্রাণতোষবাবার কথা শুনতে শুনতে আমার নগ্নতার লজ্জা কেটে গিয়েছিল। তিনি নীচু হয়ে, আমার গুহ্যদ্বারে আঙুল ছুঁইয়ে লিঙ্গমূল পর্যন্ত একটি সরলরেখা টেনেছিলেন, এবং সেই সরলরেখাটিকে মাঝখানে রেখে, একটি ত্রিকোণ রেখা এঁকে বলেছিলেন, "এই এই যোনিরূপ ত্রিকোণের বাঁয়ে ইড়া, ডাইনে পিঙ্গলা, মাঝখানে সুষুম্না। আমরা যে নিশ্বাস নিচ্ছি, তা ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা মনে করি, দুটো নাকে সোজাসুজি নিশ্বাস নিচ্ছি। তা আদৌ নয়। এই দুই—দুই নিশ্বাস যখন পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়, তখনই সুষুম্নাতে অনুভব হয়। এই অনুভূতি যোগ সাধন ছাড়া টের পাওয়া যায় না।

"এই সুষুম্না নাড়ির ভিতরেই মূলাধারে আছেন কুণ্ডলিনী। ইনি ঘুমিয়ে আছেন, কিন্তু ঘুমন্ত মানুষের যেমন নিশ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে, কুণ্ডলিনীরও তেমনি নিশ্বাস প্রশ্বাস বহে। ব্রহ্মাণ্ডেরও কুণ্ডলিনী আছে, তিনি ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণশক্তি, আর আমাদের শরীরে তিনি জীবশক্তি। আমি জানি, তোর কাছে এগুলো কিছু অর্থহীন শব্দ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না, তাই নয় কি?"

আমি বলেছিলাম, "প্রায় তাই, তবে আপনার স্পর্শে আর কথায় আমার মন একটা বিশেষ জায়গায় যেন পৌঁছেছে।"

"ওটা আসলে নতুন অভিজ্ঞতার একটা অভিনবত্ব বোধ।" প্রাণতোষবাবা হেসে বলেছিলেন, "সাধনার অনুভূতি নয়। তবু এ ভাবটি তোর ধারণা করতে সাহায্য করবে। এখন এই যে যোনিরূপ ত্রিকোণ মধ্যে, সুষুম্নার গভীরে কুণ্ডলিনী আছেন, এখানে আছে কামবীজ, আর এই কামবীজের ওপরেই রয়েছেন স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখে, কুণ্ডলিনী নিজের মুখ দিয়ে চুম্বন করে, তাঁকে জড়িয়ে ধরে আছেন। উভয়েই সুপ্ত। সাধকের কাজ হচ্ছে, এই কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তোলা।

কুল হলো শক্তি। তিনি কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকেন বলেই কুলকুণ্ডলিনী। ইনি মহাশক্তি।

"এখন, এঁকে জাগাতে হলে সাধককে প্রাণায়ামের সাহায্যে সুষুম্নায় বায়ুচালনা করতে হবে। সুষুম্না মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এই সুষুম্নার বিবর থেকে কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। এই যাবার পথে ষটচক্র ভেদ করতে হয়। মনে কর, যেন পাঁচটি স্টেশন পেরিয়ে, ছয়ে পোঁছুতে হবে। সেগুলো কোথায়? একটি মূলাধারে (তিনি আমার লিঙ্গমূলে স্পর্শ করলেন), তারপর স্বাধিষ্ঠান (বস্তিদেশে স্পর্শ করলেন), তারপর মণিপুর (নাভিতে স্পর্শ করলেন), এই হলো অনাহত (বুকে স্পর্শ করলেন), এইখানে বিশুদ্ধ (গলা স্পর্শ করলেন), এইটি আজ্ঞা চক্র (দুই ভ্রূর মাঝখানে স্পর্শ করলেন)। তারপর সহস্রার ব্রহ্মরন্ধ্র, সেখানে আছেন পরমশিব। এই চক্রগুলোর আরো অনেক ব্যাখ্যা আছে, সে সব তুই বুঝবি না, আমি কেবল চক্রের জায়গাগুলো দেখালাম। কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রারে তুলে নিলে, পরম শিবের সঙ্গে তাঁর মহা-মিলন ঘটবে। শিবশক্তির এই মিলনে পরমামৃত ক্ষরিত হয়, আর সাধক সেই মিলনের অনুভূতিতে সুখ আনন্দরসে মগ্ন হয়। তখন তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকে না, তিনি তখন চিদানন্দস্বরূপ। কিন্তু তুই যদি ভাবিস, কুণ্ডলিনীকে সাধক সহজেই চক্রভেদ করে নিয়ে যেতে পারে, তা হলে ভুল। কুণ্ডলিনী বারে বারেই তাঁর নিজের জায়গায় নেমে আসতে চান। সাধকের সেখানেই কঠিন পরীক্ষা, বারে বারেই তাঁকে জাগিয়ে টেনে তুলতে হয়। মূলতঃ কুম্ভকের দ্বারাই তা সম্ভব। এই শিব শক্তির মিলনই আমাদের মূল সাধনা।"

আমি কিছুটা অবাধ সরলভাবেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "তা হলে এই সাধনার মধ্যে গোপনীয়তার কী আছে?"

প্রাণতোষবাবা অট্ট হেসে বলেছিলেন, "ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছিস। কাপড় পরে বোস্ বলছি।"

আমি তাড়াতাড়ি কাপড় পরে সাব্যস্ত হয়ে বসেছিলাম। তিনি কয়েক মুহূর্ত চোখ বুজে বসেছিলেন। তারপরে চোখ খুলে বলেছিলেন, "এতক্ষণ তোকে যা বলছিলাম, এগুলো সবই যোগ সাধনার বিষয়। কিন্তু এই সাধনা, সাধিকা রমণীর সঙ্গে করতে হয়। আমাদের ভিতরে শিব শক্তিকে মিলন করাতে হলে, আমাকে আর আমার সাধিকাকেও শিব শক্তি রূপে মিলিত হতে হবে। নারী হলো শক্তি,আর শক্তি সাধনার দ্বারাই, সেই পরম শিব শক্তির মিলন সম্ভব। আসলে, শিব আর শক্তি, দুই রূপে এক আর অভিন্ন। সব সাধনাই শক্তিরই সাধনা। "প্রকৃতি" সাধনাই শক্তি সাধনার স্বরূপ। বলতে কি, এই জগৎই শক্তি, সেই জন্যই আমরা বলি, নারী ত্রিলোকের জননী, তিনিই ত্রিভুবনধারা।"

আমি বলে উঠেছিলাম, "যুবতী রহিতং দেবি কুতো বিদ্যা, কুতো মন্তুঃ/নিগুর্ণং পরমং ব্রহ্ম প্রধানা যুবতীগণাঃ।"

প্রাণতোষবাবা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কার কাছে শুনলি এ কথা?"

আমি বলেছিলাম, "পবিত্রীমায়ের কাছে।"

তিনি হেসে বলেছিলেন, "তা হলে তো তুই আসল লোকের মুখ থেকেই সব শুনেছিস।"

"আজ্ঞে না, সব শুনিনি।" আমি বলেছিলাম, "নারীকে কি রকম শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখা উচিত, সে-কথা বলতে গিয়েই তিনি আমাকে কয়েকটি শ্লোক শুনিয়েছিলেন।"

প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "পবিত্রী মায়ের সেই অধিকার আছে। এমনকি তিনি এখন স্ত্রীগুরুও হতে পারেন। এটা খুবই বিরল ব্যাপার, তবু আমাদের মধ্যে স্ত্রীগুরুর কাছ থেকেও দীক্ষালাভ করা যায়। যাই হোক আমাদের বীরাচারী তন্ত্র মতে পঞ্চ 'ম' কার আবশ্যিক। মদ্য পান, মাংস মৎস্য মুদ্রা, খাওয়া আর শেষে মৈথুন। তন্ত্র মতে প্রকৃতি মিলন হলো যৌন মিলন, অর্থাৎ পঞ্চম 'ম' কার। কিন্তু এ মিলন বংশ রক্ষার্থে না। একে বলা যায় যৌন-যোগ মিলন। এর মধ্যে আলিঙ্গন, চুম্বন,

স্তন-মর্দন, দর্শন, স্পর্শন, যোনিবিকাশ, লিঙ্গ ঘর্ষণ, প্রবেশ, আর স্থাপন, এগুলোকে আমরা বলি পুষ্প। অর্থাৎ পূজারই নয়টি ফুল। এর সঙ্গেই আছে, রেচক, পূরক, কুম্ভক, জপ আর মন্ত্র। সেই জন্যই যৌন-যোগ মিলন, আর এই মিলনের মধ্য দিয়েই, কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে তুলে পরম শিবের সঙ্গে মিলন ঘটানো হয়। সহস্রারে এই যে শিব শক্তির মিলন, সেই সময়ে সাধক সাধিকার অনুভূতির কথা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না। এখন তোর মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন জাগছে, আমাদের এই মিলনে কি বীর্যপাত ঘটে না ?"

আমি বলেছিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "ঘটে, কিন্তু সেটা আমাদের যোগ ক্ষমতা ও ইচ্ছাধীন। সহস্রারে যে শিব শক্তির মিলন ঘটছে, সেই অনুভূতিতে আমরা চিদানন্দস্বরূপ থাকি, তারপরে একটি বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণ করে, শুক্র ত্যাগ করি। তা বলে, তুই যদি মনে করিস, এই স্খলন মানেই, সবই অশক্ত আর শিথিল হয়ে পড়লো, তা হলে ভুল হবে। কুণ্ডলিনীকে যে-ভাবে চক্রভেদ করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই ভাবেই ধাপে ধাপে তাঁকে তাঁর জায়গায় নামিয়ে আনতে হবে।"

কিন্তু আমার মনে তখনো একটি জিজ্ঞাসা কাঁটার মতো ফুটেছিল। প্রাণতোষবাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়ে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, "বুঝেছি, ভাবছিস, এর অনিবার্য ফল, সন্তানটি কোথায় ? অর্থাৎ ভৈরবীর গর্ভসঞ্চারের ব্যাপারটা কী, তাই না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" আমি বলেছিলাম।

তিনি আবার ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলেছিলেন, "বুঝেছি। একটা কথা তার আগে বলে রাখি, আসলে এ সাধনা ভোগ মোক্ষ। আমরা যখন মিলনের মধ্যে সুষুম্নার পথে কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলি তখন বলি, 'আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে আহুতি দিচ্ছি।' এখন তোর কথার জবাবে বলছি, 'ঋতুযুক্তলতামধ্যে সাধয়েদ্বিধিবন্মুদা।' অর্থাৎ ঋতুমতী

শক্তির সঙ্গে মিলন। এ অবস্থায় সন্তানের জন্ম সম্ভব নয়, এটা সবাই জানে। অবিশ্যি ঋতুযুক্তলতা বলতে, যে কয়দিন নারী রজঃস্বলা থাকবে, সেই কদিনই বোঝানো হচ্ছে না। ঋতুস্রাবের মধ্যে, এবং আগে ও পরের কয়েকটি দিনও বোঝায়। এই মিলনকে আমরা বলি 'ভাণ্ডের' সঙ্গে 'ব্রহ্মাণ্ডের' মিলন। এত কথা শুনে কোনো ধারণা করতে পারলি কি ?"

"পারলাম, কিন্তু মর্ম কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

"তা হলে তো তুই একজন সাধক হতে পারতিস।" তিনি হেসে বলেছিলেন, "তবে মনে রাখিস, এ সাধনার বিষয় শুনতে যতো সহজ, কাজে অতি কঠিন। অনেকটা বন্য বাঘের গলা জড়িয়ে ধরার মতো, নয় তো বিষধর সাপের ফণা আঁকড়ে ধরার মতো। যা এবার উঠে দরজাটা খুলে দে।"

আমি তাঁর আদেশ পালন করেছিলাম। দরজা খুলেই দেখেছিলাম, উঠোনের বিপরীত দিকে বাঁধানো ঘরের রকে রোদে পিঠ দিয়ে বসে আছেন পবিত্রী মা এবং জগত। তাঁদের দুজনেরই খোলা চুল পিঠে ছড়ানো। বোঝা যাচ্ছিল, স্নান শেষে তাঁরা জামা কাপড় পরে চুল শুকোচ্ছেন। আরও দুতিন জন রমণী তাঁদের সামনে। কেউ কুটনো কুটছে, কেউ বেল পাতা বেছে রাখছে। জগত জবাফুলের মালা গাঁথছেন, এবং সম্ভবতঃ তিনি গান করছিলেন। তিনি অপূর্ব শ্যামা সঙ্গীত করেন। আমার দরজা খোলার শব্দে পবিত্রীমা ফিরে তাকিয়ে ঢুলঢুলু চোখে হেসে বলেছিলেন, "কী, বাপ ব্যাটায় কী এত কথা হচ্ছে ?"

আমি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারিনি। এখনো আমার মস্তিষ্কে প্রাণতোষবাবার যোগ ও তন্ত্র ব্যাখ্যার বিষয় অস্পষ্ট ভাবে নানাভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, এবং পবিত্রীমাকে আমি যেন অন্য এক চোখে দেখছিলাম। পবিত্রীমা গলা তুলে বলে উঠেছিলেন, "বাবা, আপনার ছেলেটি আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে দেখছে কেন ?"

প্রাণতোষবাবা ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠেছিলেন, "বোধহয় ভাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখছে।"

কথাগুলো শুনে আমার গায়ের মধ্যে যেন কেঁপে উঠেছিল। প্রাণতোষবাবা আবার বলেছিলেন, "মা. আমাদের দুজনকে একটু চা দিতে বলো।"

পবিত্রীমা বলেছিলেন, "পাঠিয়ে দিচ্ছি বাবা।" তিনি অঙ্গুলি সংকেতে আমাকে ঘরের মধ্যে যাবার নির্দেশ দিয়ে, দু'চোখের পাতা কাঁপিয়ে হেসেছিলেন। তাঁকে দেখাচ্ছিল এক স্থির যৌবনা লাবণ্যময়ী যোগিনীর মতো।

আমি ঘরের ভিতর ঢুকে. আমার আসনে বসে বলেছিলাম, "আপনাদের দুজনের মা বাবা সম্বোধনের রহস্য বুঝতে পারি না।"

"ও যে আদিরূপা জননী।" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "ও সৃষ্টি করে, লয়ও করে। ও নানা রূপেই আমার ব্রহ্মাণ্ড। আমার ধ্যান জ্ঞান যোগ ওরই দান। আমি তো শব। ওর কল্যাণে শিবত্ব প্রাপ্ত হই। ও আমার ধাত্রী, পালিকা, আবার ও-ই আমার জন্মদাত্রী। এ আত্মোপলব্ধি সাধনায় হয়। কেবল মাত্র সংসারের বিচারে সম্পর্ক স্থির হয় না। আচ্ছা, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, জবাব দে।"

আমি তাঁর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলাম। তিনি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তোর জননেন্দ্রিয়র সঙ্গে প্রথম কবে নারীর জননেন্দ্রিয়র স্পর্শ ঘটেছিল?"

আমি লজ্জা পেয়ে বলেছিলাম. "আজ্ঞে, আমার জীবনে অল্প বয়সেই নারী সংযোগ ঘটেছিল।"

তিনি হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন. "তবু শুনি, সেই বয়সটা কতো?"

বলেছিলাম, "আজ্ঞে কৈশোরেই অবৈধভাবে এক আত্মীয়ার—।"

"ইডিয়ট!" তিনি ধমক দিয়ে বলে উঠেছিলেন. "তোর ওসব কৈশোর বৈধ অবৈধ সংযোগের কথা শুনতে চাইনি। ভেবে ছাখ্ জন্ম লগ্নেই মাতৃযোনির সঙ্গে তোর অঙ্গের স্পর্শ হয়েছিল। তাই নয় কি?"

আমি হতবাক বিস্ময়ে চুপ করেছিলাম। এরকম একটি জন্ম-বৃত্তান্তের বাস্তবের কথা আমার চিন্তায় আসেইনি। তবু না জিজ্ঞেস করে পারিনি, "সেটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু তার সঙ্গে সাধনার যোগাযোগ কোথায় ?"

"যোগ মিলন সাধন হলো সাধকের সেই অবস্থায় যখন সে ইন্দ্রিয় বৃত্তিসমূহের অনুভূতি আর জ্ঞানের অতীত।" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "সেইজন্যই তিনি আমার আদিরূপা জননীও বটেন।"

বস্তুত, তাঁর ব্যাখ্যা থেকে আমি সম্যক কিছু বুঝতে না পারলেও, দূরাগত শব্দের মতো একটা উপলব্ধি ঘটেছিল। তবে সেই মুহূর্তে ম্যাকসিম গর্কির "আত্মজীবনী"-এর দাদামশাই ও দিদিমার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তাঁরা বৃদ্ধ বৃদ্ধা পরস্পরকে মা ও বাবা সম্বোধন করতেন।

প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "আজ তো অনেক কথা হলো। এখনই তোর আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি ?"

আমি বলেছিলাম, "আজ আর একটি বিষয়েই আপনার কাছে জানতে চাই।"

"বল্, শুনি।"

আমি কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই পবিত্রীমা ঘর আলো করে ঢুকেছিলেন। তাঁর এক হাতে একটি ধূমায়িত কালো পাথরের গেলাস অন্য হাতে চিনে মাটির চায়ের কাপ ডিশ। পাথরের গেলাসটি আগে নামিয়ে দিয়েছিলেন প্রাণতোষবাবার সামনে, তারপরে আমার সামনে কাপ ডিশ। প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "বসো মা।"

পবিত্রী মা তাঁর আসনের পাশেই একটি লাল কাপড়ের আসনের ওপর বসেছিলেন। কিন্তু আমি বিপদগ্রস্ত বোধ করেছিলাম। প্রাণতোষবাবাকে আমার যা জিজ্ঞাস্য ছিল, তা হলো, পবিত্রীমায়ের নিজের ঘরের দেওয়ালে, আমি সাদা কালো একটি পট দেখেছিলাম। পটের বিষয়, দিগম্বরী কালী, দিগম্বর শিবের বস্তিদেশের দু পাশে দু পা

ছড়িয়ে বসে আছেন। সেই কালী চতুর্ভুজা নন, দ্বিভুজা, কিন্তু জিভ কেটেছেন।

প্রাণতোষবাবা চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে বলেছিলেন, "কী জিজ্ঞেস করবি, কর ?"

আমি বিব্রত লজ্জিত চোখে পবিত্রীমায়ের দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নামিয়েছিলাম। তাঁরা দুজনে পরস্পরের দিকে অবাক দৃষ্টিবিনিময় করেছিলেন। পবিত্রীমা আমার দিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "কী ব্যাপার, আমার সামনে কিছু বলতে লজ্জা করছে নাকি ?"

"আশ্চর্য !" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "এই মাত্র কী বলে তোকে এই মহিলার পরিচয় দিচ্ছিলাম ? এঁর সামনে লজ্জা করছিস্ ? অথচ এঁর ডাকেই তুই আমার কাছে এসেছিস !"

খুবই সত্যি কথা। আসলে আমি নারী জাতি সম্পর্কে আমার প্রচলিত ধারণা থেকেই লজ্জা পেয়েছিলাম। আমি সহজেই লজ্জা কাটিয়ে বলেছিলাম, "আমি পবিত্রীমায়ের ঘরে একটি শিব ও দ্বিভুজা কালীর পট দেখেছি। কালীর এরকম মূর্তি আমি আর কোথাও দেখিনি।"

ওঁরা দুজনেই আবার পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "মায়ের ঘরের পটের কথা মায়ের সামনে বলতে লজ্জা কী ? কালীর ওই মূর্তির নাম 'বিপরীতরতাতুরা।' রতিক্রীড়ায় পুরুষের ওপরে নারী যখন ক্রিয়াশীলা, তাকে বলে বিরপীতরতিবিহার। আমরা বলি, শবরূপী শিবের ওপর শক্তিরূপিণী কালী আসীনা। শিবকে জাগিয়ে তুলছেন। অথবা, যেহেতু শিব শক্তি এক আর অভিন্ন, এক্ষেত্রে কালী স্বেচ্ছায় সানন্দে সৃষ্টিকর্মে ব্যাপৃতা। দেবীর এটি সক্রিয় ভূমিকা। আরো স্পষ্ট করে বললে বলতে হয়, মহাদেবী পুরুষকে অধোদেশে রেখে রমণ করছেন। কিছু বোঝা গেল ?"

আমি পবিত্রীমায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাঁর মুখে সব সময়েই যেমন একটি হাসি লেগে থাকতো, সেইরকমই ছিল। আমি বলেছিলাম, "একটা অনুমান হলো।" কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি, কালীর বহু নামের বহু ব্যাখ্যার মতোই, একটি ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু বুঝিনি, যার কোনো সম্যক উপলব্ধি আমার ছিল না। তবে, তাঁর ব্যাখ্যা মতো, ভাণ্ডে আর ব্রহ্মাণ্ডে যদি কোনো তফাত না থাকে, এবং কালীই যদি ব্রহ্মাণ্ড হোন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই শিবের সঙ্গে বিপরীত বিহারে সঙ্গত হতেই পারেন। কারণ তন্ত্রমতে সাধক-সাধিকারাও শিব শাক্তরূপে এইরকম বিহার করেন।

"অনুমান আর ধারণা ছাড়া তোকে আমি কিছুই দিতে পারি না।" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, এবং পবিত্রীমায়ের দিকে ফিরে তাকিয়ে ছিলেন, "মা, তুমি অনুমতি দিলে, সামনের অমাবস্যায় আমাদের চক্রে ওকে থাকতে বলবো।"

পবিত্রীমায়ের ভুরু জোড়া এক মুহূর্তের জন্য কুঁচকে উঠেছিল। আবার স্বাভাবিক মুখ করে বলেছিলেন, "বলতে পারেন, তবে জগত আর যোগেশ্বরের অনুমতি থাকা দরকার।"

"নিশ্চয়ই।" প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "ওদের অনুমতি তো অবিশ্যিই চাই। আমি চাইলে আশা করি পাবো।"

পবিত্রীমা হেসে বলেছিলেন, "তা পাবেন, কিন্তু কি অধিকারে ও চক্রে ঠাঁই পাবে?" তিনি আমার দিকে তাকিয়েছিলেন।

প্রাণতোষবাবা আমার দিকে সস্নেহ চোখে একবার তাকিয়ে বলেছিলেন, "ও অনধিকারী, কিন্তু অবিশ্বাসী নয়। ওর কথা থেকে বুঝেছি, তন্ত্রমতে ওর আত্মোপলব্ধির একটা ব্যাকুলতা আছে।"

তিনিই যথার্থই বলেছিলেন। পবিত্রীমা আমার দিকে তাকিয়ে, তাঁর সেই মধুর হাসি হেসে বলেছিলেন, "তথাস্তু!"

উপরোক্ত ঘটনার পাঁচ দিন পরেই, সেই প্রতীক্ষিত রহস্যময় অমাবস্যায়

রাত্রিটি এসেছিল। প্রাণতোষবাবা পবিত্রীমাকে বলার আগে, সেই রাত্রিটির বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। হয় তো আমি কিছুই জানতাম না। হয়তো আমি অমাবস্যার আগেই কামাখ্যা ত্যাগ করতাম। পরে প্রাণতোষবাবা আমাকে বলেছিলেন, "এটা ঠিকই, আমাদের সাধনপ্রণালী সবই গোপনে করতে হয়, কারণ পঞ্চ 'ম' কারের সাধনা অধিকাংশ লোকের চোখেই নিতান্ত ভোগ বাসনা চরিতার্থ করা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে এমন উপদেশও আছে, তন্ত্র সাধনার প্রতি যে প্রকৃত আগ্রহী, বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা পোষণ করে, পশুসুলভ মনোবৃত্তি ত্যাগ করে সাধনার অন্তর্নিহিত বিষয়কে বুঝতে চায়, তার সামনে চক্রানুষ্ঠান করা যায়। তোর সম্পর্কে আমার সেই বিশ্বাস আছে। তোকে আমি সাধন বিষয়ে বলেছি। বাস্তবে তার স্বরূপ কী, সেটাও আমি তোকে দেখাতে চাই। আমি বিশ্বাস করি, এটা তোর জীবনে একটা অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।"

তিনি মিথ্যা কিছু বলেননি। আমি আগেই বলেছি, তন্ত্র সাধন-প্রণালীর বিষয় জানা ও দেখা একটি দুর্লভ সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমার প্রতি তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার মতো মনের শক্তি আমার ছিল কী না, সে-বিষয়ে আমি নিজেই সন্দিহান ছিলাম। অমাবস্যার রাত্রিটি যতোই এগিয়ে আসছিল, ততোই যেন একটা দ্বিধা আর উৎকণ্ঠা আমার মনের ওপর চেপে বসছিল। অবিকৃত সুস্থ মন নিয়ে কি আমি চক্রে উপস্থিত থাকতে পারবো? এমন কি, পালাবার কথাও আমার মনে এসেছিল।

আমার এইরকম মানসিক অবস্থার মধ্যেই, একটা বিষয় আমার চোখে বিশেষ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। রোজই কিছু শিষ্যা সেবিকারা এসে উষ্ণ সুগন্ধিজলে পবিত্রীমা আর জগতকে স্নান করাতো। সাবান ব্যবহার হতো কী না, জানি না। সেবিকারা রোজই পাহাড়ের নীচে

ব্রহ্মপুত্রের কর্দম মৃত্তিকা নিয়ে আসতো। অগুরু ধূপের ধোঁয়ায় তাঁদের কেশচর্চা হতো। যেন বিয়ের আগে, দুটি কন্যাকে বিশেষ-ভাবে তৈরি করা হচ্ছিল। যদিও তা অলংকারের সাজ নয়, কিন্তু দুজনেই যেন আরও রূপবতী আর উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলেন। রুদ্রাক্ষ আর প্রবালের মালা ছাড়াও, দেববালাদের মতোই তাঁদের কেশে ও গলায় ফুলের মালা ঝুলতো। অধিকাংশ সময়েই তাঁরা দুজনে ঘরে দরজা বন্ধ করে কী করতেন আমি জানি না। মাঝে মাঝে জগতের মিষ্টি গলার শ্যামা সঙ্গীত শুনতে পেতাম, এবং দেখে মনে হতো, তাঁরা সব সময়েই যেন একটা ভাবাবেশে আছেন।

অবাবস্যার তিন দিন আগে সাধক যোগেশ্বর এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শুনেছিলাম, তিনি কাছাড়ের শিলচর থেকে এসেছিলেন। বয়স তিরিশের বেশি না। কিন্তু তাঁর মাথায় ছিল কোঁচকানো বড় বড় চুল আর এক জোড়া গোঁফ। মেদবর্জিত স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দীর্ঘদেহ। প্রাণতোষবাবা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যোগেশ্বর আলাপে ছিলেন অমায়িক আর বিনীত। তিনি আসার পরে, প্রাণতোষবাবার সঙ্গে, পাহাড়ী উঠোনের এক ধাপ নীচে সেই বিশেষ ঘরটিতে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ সময় কাটাতেন। তাঁরা কী করতেন, জানি না। যেমন জানতাম না পবিত্রী মা ও জগতের সম্পর্কে। দুটো দিন আমি প্রায় একলা হয়ে পড়েছিলাম।

অমাবস্যার সেই দিনটি এসেছিল। এখানে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলে নেওয়া দরকার। প্রাণতোষবাবা আমাকে বলেছিলেন, কামাখ্যার প্রকৃত নাম কামপীঠ। দেবীর মহামুদ্রা বা যোনি এখানে পতিত হয়েছিল। এর আর এক নাম কামগিরি। আশ্রমে চালাঘরে একটি আলাদা মন্দির ছিল। সেখানে মাটির মাতঙ্গী মূর্তি ছিল। মূর্তিটি দ্বিভুজা, পীনপয়োধরা শ্যামা, নাভিস্থলে ত্রিবলী, নিম্নাঙ্গ রত্নালংকারে আবৃত। হাতে ও গলায় নানা অলংকার, কিন্তু নরমুণ্ডের মালা ছিল না, জিভও বাইরে ছিল না। শিবরূপী শবের ওপর

আসীনা। ইনি ষোড়শী, এবং এঁর পীঠস্থানও কামাখ্যায় অবস্থিত। আশ্রমে প্রতিদিন এই দেবীর পূজা হতো। এ ছাড়া, আশ্রমে করালী এবং ধীরু নামে দুই যোগী শিষ্যও ছিলেন। যাঁদের দেখে শিবের নন্দীভৃঙ্গির কথা মনে পড়ে যেতো। দুজনেরই শক্তিশালী বিশাল চেহারা। লাল কাপড় তাদের গায়ে থাকতো, আর বাঁশের লাঠি। আশ্রমের দেখাশোনার ভার ছিল তাঁদের ওপর। আর ছিল একটি কালো কুকুর, অপরিচিত লোকের গন্ধ পেলেই যে গর্জে উঠতো। সবাই তাকে 'কালো' বলে ডাকতো।

অমাবস্যার দিন ভোরবেলা থেকেই আশ্রমে অনেক নরনারীর ভিড় হয়েছিল। কয়েকজন পাঁচটি কচি পাঁঠা নিয়ে এসেছিল। পরে পশুগুলোকে স্নান করিয়ে, কামাখ্যার মন্দিরে বলি দিয়ে আনা হয়েছিল। প্রাণতোষবাবা আর যোগেশ্বর সারাদিনই মাতঙ্গী দেবীর পূজায় ব্যস্ত ছিলেন, এবং তাঁদের দুজনকে সর্বদাই সাহায্য করেছিলেন পবিত্রীমা ও জগত। প্রায় অপরাহ্নে আমি প্রায় চল্লিশ জন নরনারীর সঙ্গে দ্বিপ্রহারিক আহার করেছিলাম। সেইসব খাদ্যই ছিল মাতঙ্গীর ভোগ এবং সেই আমি প্রথম জানলাম, পেঁয়াজ রসুন ইত্যাদি ছাড়াও কেবল হিং দিয়ে মাংস রান্না হয়, এবং ঘৃতান্নের সঙ্গে তা রীতিমতো সুস্বাদু লেগেছিল।

কিন্তু প্রাণতোষবাবা যোগেশ্বর পবিত্রীমা জগত এঁরা কেউ খাননি। তাঁদের পূজা সন্ধ্যা পর্যন্ত চলেছিল। তাঁদের পূজা শেষ হবার আগেই, আশ্রম একেবারে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। বাইরের লোক বলতে আমি একলাই ছিলাম। একটা স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। এবং সেই সঙ্গে পাহাড়ের ওপরে গাঢ় অন্ধকার। করালী আর ধীরু যোগী আশ্রমের সব ঘরে একটি করে হারিকেন জ্বেলে দিয়েছিল। 'কালো' ঘরে বাইরে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

বিকালের দিকে মাতঙ্গীর মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। ভিতরে কী ঘটছিল, কিছুই জানি না। করালী এবং ধীরু যোগী, দুজনেই

নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দেখেছিলাম, তাঁরা দুজনে, উঠোনের ঢালুতে বিশেষ ঘরটিতে নানা জিনিস নিয়ে রাখছিলেন। একটি ঘট, আমের পল্লব, পাথরের বড় পাত্রে রক্তচন্দন, অন্য পাত্রে সিন্দুর, নতুন প্রদীপ ইত্যাদি ছাড়াও কর্পূরের গন্ধ পেয়েছিলাম।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই মন্দিরের দরজা খোলা হয়েছিল। প্রাণতোষবাবা সবাইকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এসেছিলেন। করালী এবং ধীরু দুটি হ্যারিকেন হাতে এগিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সবাইকে প্রণাম করেছিলেন। প্রাণতোষবাবা মুখ তুলে আশেপাশে তাকাচ্ছিলেন। আমার মনে হয়েছিল, তিনি আমাকেই খুঁজছেন। আমি তাঁর সামনে গিয়েছিলাম এবং তাঁকে, পবিত্রীমা জগত এবং যোগেশ্বরকে প্রণাম করেছিলাম। তাঁরা সকলেই আমার মাথায় হাত স্পর্শ করেছিলেন। তাঁদের সবাইকেই বেশ প্রসন্ন দেখাচ্ছিল। একটি নতুন ব্যাপার চোখে পড়েছিল। জগতের দুই ভুরুর মাঝখানে ও সিঁথেয় সধবার মতো সিন্দুর লাগানো ছিল। দুই হাতে শঙ্খ বলয়। তাঁর এবং যোগেশ্বরের গলায় দুটি মালা ঝুলছিল। এর একটাই অর্থ, জগতের সঙ্গে যোগেশ্বরের শৈব বিবাহ মাতঙ্গীর মন্দিরেই সম্পন্ন হয়েছিল। পবিত্রীমা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি খেয়েছো?"

"হ্যাঁ।"

"রাত্রে কি আবার খাবার দরকার হবে?"

আমি তাঁর কথার অর্থ বুঝতে পারিনি। প্রাণতোষবাবা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, "আমরা এখন চক্রে বসবো। সেখানে থাকলে, তোর আর বাইরে আসা চলবে না। যদি খেতে হয়, এখনই খেয়ে নিতে হবে।"

বিকাল প্রায় চারটেয় দুপুরের খাবার খেয়ে, সন্ধ্যায় আমার পক্ষে আবার খাওয়া অসম্ভব ছিল। রাত্রে আর খাবার ইচ্ছাও ছিল না। বলেছিলাম, "না, আমি আর খাবো না।"

"তবে আয়।" প্রাণতোষবাবা আমাকে ডেকেছিলেন, এবং

আমাকে দেখিয়ে ধীরুকে বলেছিলেন, "একে একটা কম্বল দিয়ে দিস।"

আমি চারজনের পিছনে পিছনে, পাহাড়ী ঢালুর সেই ঘরে গিয়ে ঢুকেছিলাম। মাপের দিক থেকে ঘরটি আঠারো বাই বারো ফুটের কম না। আমি ঘরে ঢুকতেই প্রাণতোষবাবা দরজার পাশেই ডান দিকের কোণে পেতে রাখা একটি কম্বলের আসন দেখিয়ে বলেছিলেন, 'এইটি তোর বসবার জায়গা। মলমূত্র ত্যাগ করতে হলে এখনই সেরে আয়।"

আমি সেরকম কিছু অনুভব করছিলাম না। কিন্তু কেমন একটা ভয় আর সংশয় বোধ করছিলাম। আমি আমার জায়গায় বসে বলেছিলাম, "তার দরকার নেই।"

এই সময় বাইরে থেকে শৃগাল ডেকে উঠেছিল। ধীরু এসে আমার কোলের ওপর একটি ভাঁজ করা কম্বল দিয়ে গিয়েছিল। প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, "ধীরু, তোমরা সব নিয়ে এসো।" যোগেশ্বরের দিকে ফিরে বলেছিলেন, "তুমি তোমার কাজ শুরু কর।"

ঘরের প্রান্তে যেখানে ত্রিশূল গাঁথা ছিল, এবং যন্ত্র আঁকা ছিল, প্রাণতোষবাবা সেখানেই এক পাশে একটি আসনে বসেছিলেন। অন্য পাশে পবিত্রীমা ও জগত পাশাপাশি বসেছিলেন। আমি হারিকেনের আলোয় দেখেছিলাম, যোগেশ্বর তেলের সঙ্গে মেশানো সিন্দূরের পাত্রটি তুলে নিয়ে, স্থায়ী যন্ত্রটির পাশেই আর একটি যন্ত্র এঁকেছিলেন। যন্ত্রটি খুবই সাধারণ। প্রথমে একটি ত্রিকোণ, তাকে ঘিরে একটি চতুষ্কোণ ঘর এঁকেছিলেন। বাকিরা সকলেই নিবিষ্ট এবং একাগ্রভাবে যোগেশ্বরের ক্রিয়া দেখছিলেন। তারপরে যোগেশ্বর একটি সাদা রঙ করা ঘট কোলে তুলে নিয়ে, সিন্দূর দিয়ে ঘটের গায়ে স্বস্তিকা চিহ্ন ও মানবদেহ এঁকেছিলেন। অন্য একটি ঘট থেকে, আঁকা ঘটে জল ঢেলেছিলেন। হাল্কা কর্পূরের গন্ধে মনে হয়েছিল, জলে কর্পূর মেশানো ছিল। ঘটের মুখের ওপর আমের পল্লব এবং একটি নারকেল

রেখেছিলেন, এবং কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে, সিঁদুরের আঁকা যন্ত্রের ওপর ঘটটি রেখেছিলেন। সামনে রাখা প্রদীপ ও ধূপদানিতে ধূপ জ্বেলেছিলেন। তারপরে আবার মন্ত্র জপ, ঘটের সামনে ফুল এবং চন্দন দিয়ে পূজা করেছিলেন। ফিরে তাকিয়েছিলেন প্রাণতোষবাবার দিকে।

প্রাণতোষবাবা হেসে মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন। যোগেশ্বর পবিত্রীমা ও জগতের দিকেও তাকিয়েছিলেন। তাঁরাও মাথা ঝাঁকিয়েছিলেন। সেই সময়েই করালী এবং ধীরু, কয়েকবার যাতায়াত করে, বিভিন্ন পাত্রে নানা ভোজ্যবস্তু এনে রেখেছিলেন। দেখে এবং গন্ধের দ্বারা বুঝতে পেরেছিলাম, রান্না করা মাংস, মাছ ভাজা, ঘৃতান্ন, কিছু ফল মূল, মিষ্টি, এবং অনেকটা শিরস্ত্রাণের মতো দেখতে একটি পিতলের পানের কৌটো, ওটা যে আসামের বিশেষ এক ধরনের ঢাকা দেওয়া পানের কৌটো তা আমি আগেই দেখেছিলাম। খাদ্য দ্রব্যের মাঝখানে একটি মাটির কলসীও রাখা ছিল।

প্রাণতোষবাবা নিজে উঠে, যেখানে পাঁচটি নরকরোটি রাখা ছিল, তার থেকে চারটি এনে কলসীর সামনে রেখেছিলেন। তিনি কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করে, তামার পাত্রে রাখা জল নিয়ে সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের ওপর ছিটিয়ে দিয়েছিলেন, এবং সকলেই একাগ্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সমস্ত দ্রব্যের দিকে তাকিয়েছিলেন। তারপরে প্রাণতোষবাবা ফুল এবং রক্ত-চন্দন নিয়ে কলসীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন, এবং চারজনেই কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ ছিলেন। ধ্যান শেষে প্রাণতোষবাবা দু হাতের বিভিন্ন মন্ত্রের দ্বারা, ঠোঁট নেড়ে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করে, আগে কলসীটি স্পর্শ করেছিলেন, তারপরে সমস্ত খাদ্য দ্রব্যর পাত্রগুলোও। এই ব্যাপারটি প্রায় আধঘণ্টা সময় নিয়ে হয়েছিল। পরে জেনেছিলাম, সে সবই ভোজ্য ও পানীয় শোধন করার জপ ক্রিয়া।

শোধনের শেষে, প্রাণতোষবাবা সকলের হাতেই নরকরোটি তুলে দিয়েছিলেন। দুই হাতের বিচিত্র ভঙ্গিতে সকলে নরকরোটি হাতে ধরেছিলেন। প্রাণতোষবাবা কলসী তুলে, প্রত্যেকের নরকরোটিতে

পানীয় ঢেলে দিয়েছিলেন, এবং নিজেও নিয়েছিলেন। গন্ধেই টের পেয়েছিলাম, পানীয় মদ ছাড়া কিছু না। সকলে একসঙ্গে করোটি পানপাত্র মুখের কাছে তুলে, এক ঢোঁকে পান করেছিলেন। জগত একবার মাত্রই নিয়েছিলেন। পবিত্রীমা তিনবার তিন পাত্র, যোগেশ্বর পাঁচবার পাঁচ পাত্র, প্রাণতোষবাবা সাতপাত্র পান করেছিলেন। তারপরে তাঁরা সকলে একই পাত্র থেকে মাংস, মৎস ফল ও মিষ্টি খেয়েছিলেন। খাবার সময় তাঁরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন, এবং পরস্পর পরস্পরকে মা বাবা সম্বোধন করে, বেছে বেছে খাদ্য খেতে অনুরোধ করছিলেন। লক্ষণীয় ছিল, চারজনের পক্ষে খাদ্যের পরিমাণ আদৌ ভূরিভোজের মতো সুপ্রচুর ছিল না।

ভোজনের পরে তাঁরা সকলেই ঘরের বাইরে চলে গিয়েছিলেন। আমার কী কর্তব্য, জানতাম না, অতএব বসেইছিলাম। করালী আর ধীরু এসে, নরকরোটিগুলো তুলে রেখেছিলেন। খাদ্য আর পানীয় কলসী তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। পিতলের পানের কৌটোটি যথাস্থানে রাখা ছিল। এবং কার্পেট জাতীয় কিছু আর কয়েকটি কম্বল ঘরের এক পাশে রেখে গিয়েছিলেন। বেতের একটি বড় পাত্রে ফুলের মালাও রেখে গিয়েছিলেন।

আমি যে একটা লোক ঘরের এক কোণে বসে আছি, তা যেন কারোর নজরেই পড়ছিল না। প্রায় পনরো মিনিট পরে প্রাণতোষ-বাবা পবিত্রীমা যোগেশ্বর ও জগত ঘরে এসেছিলেন। প্রাণতোষবাবা দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করেছিলেন। যোগেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে, ঘরের মেঝেয় প্রথমে কম্বল বিছিয়েছিলেন। তারপরে অনেকটা কাশ্মীরী গাববার মতো, লাল পশমের জমির ওপরে নানা রঙের মোটা বস্ত্র পেতেছিলেন। এসব কাজে পবিত্রীমা বা জগত হাত দেননি! তাঁরা দুজনেই শয্যা বা আসন পাতা পর্যন্ত এক পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। পাতা হয়ে গেলে আসনের মাঝখানে গিয়ে দুজনে দাঁড়িয়েছিলেন। দুজনেই যেন অপলক শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

প্রাণতোষবাবা ও যোগেশ্বর শয্যার ওপর বসে, হাতের মুদ্রা করে কোনো মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, এবং তামার পাত্র থেকে জল নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছিলেন। ফুলের পাত্র থেকে, ফুল তুলে, রক্ত চন্দনসহ সারা শয্যায় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। যোগেশ্বর হারিকেন দুটি নিভিয়ে দিয়েছিলেন। তখন ঘরে একটি প্রদীপ মাত্র জ্বলছিল। দরজা জানলা বন্ধ ঘরে প্রদীপের শিখা অকম্পিত। স্বভাবতই একটি মাত্র প্রদীপের আলো। অনেকটা কৃষ্ণপক্ষের মরা চাঁদের আলোর মতো, ঘরটিকে আবছা আর পীতাভ দেখাচ্ছিল।

অতঃপর প্রাণতোষবাবা এবং যোগেশ্বর পবিত্রীমা ও জগতের পায়ের কাছে নতজানু হয়ে, তাঁদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিলেন। আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে যা অসম্ভব। কিন্তু পবিত্রীমা বা জগতের কোনো বিকার ঘটেনি, তাঁরা দুজনেই ঠোঁট নেড়ে যেন কিছু বলেছিলেন। হয় তো বা মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। তারপরেই হতবাক বিস্ময়ে দেখেছিলাম, তাঁরা দুজনেই বিবস্ত্র হয়েছিলেন। প্রাণতোষবাবা এবং যোগেশ্বরও নগ্ন হয়েছিলেন, এবং ফুল ও মালার পাত্র, সিন্দুরের পাত্র, রক্ত চন্দনের পাত্র সামনে টেনে নিয়েছিলেন। আমি যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, দৃশ্যটি আমি দেখছি।

ঘরের আলো যতোই ক্ষীণ হোক, দুই জোড়া রমণী পুরুষের উজ্জ্বল দৃঢ় শরীর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম। প্রাণতোষবাবা ও যোগেশ্বর দুটি ক্ষুদ্র সরু কাটিতে সিন্দুর লাগিয়ে, পবিত্রীমা ও জগতের কপালে ত্রিকোণ রেখা এঁকেছিলেন। রক্তচন্দন নিয়ে উভয়ের পীনস্তনে লেপন করেছিলেন। উভয়ের গলায় পরিয়ে দিয়েছিলেন ফুলের মালা। তারপরে দুই সাধক দুই সাধিকার নাভি থেকে, বস্তিদেশে, যোনিতে, এবং প্রথমে ডান পা ও পরে বাঁ পর্যন্ত, হাতের বিভিন্ন মুদ্রার দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন। সেই রকম ভাবেই, আবার স্তনদ্বয় থেকে নাভি, এবং মাথা থেকে স্তনদ্বয় পর্যন্ত আঙুলের বিভিন্ন মুদ্রা দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন। আবার ডান পা থেকে মাথার ডান দিক পর্যন্ত, এবং

বাঁ পা থেকে মাথার বাঁ দিক পর্যন্ত, শরীরের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শ করে যেন কিছু জপ করেছিলেন। জপ বলছি কারণ এই কাজটিতে অনেকটা সময় কেটেছিল। তারপরে কেবল যোনিদেশে, ডাইনে বাঁয়ে, মধ্যখানে, দুই হাতের স্পর্শে খানিকটা সময় নিয়ে জপ করেছিলেন। জপের কথা কিছুই শোনা যাচ্ছিল না, কেবল মাঝে মাঝে মন্ত্রের দু একটি দুর্বোধ্য শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

ইতিমধ্যেই সাধকদ্বয়ের পুরুষাঙ্গ উচ্ছ্রিত হয়েছিলে। তাঁরা জল ও চন্দন দিয়ে দুজনে নিজেদের সেই বিশেষ অঙ্গের পূজা করেছিলেন, এবং স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিলাম, তাঁরা উচ্চারণ করেছিলেন, "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ"। তারপরে আবার দুই "শক্তি"র মাথায় কপালে স্তনে যোনিতে ও পায়ে ফল ও চন্দন স্পর্শ করে পূজা করেছিলেন। প্রদীপ এবং সুগন্ধ ধূপ দিয়ে তাঁদের আরতি করেছিলেন।

ইতিমধ্যে আবার বাইরে শৃগাল ডেকে উঠেছিল। আবছা পীত আলোয় পাঁচটি নরকরোটিকে জীবন্ত আর সহাস্য দেখাচ্ছিল। আমি কম্বল গায়ে না দিয়েও ঘামছিলাম। অথচ সেই অবিশ্বাস্য ঘটনার আকস্মিকতায় আমি যেন জড়বৎ হয়ে গিয়েছিলাম। জানি না, আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে আদৌ তাঁরা সচেতন ছিলেন কী না, অথবা আমাকে মনুষ্যপদবাচ্য জ্ঞান করছিলেন কী না।

প্রাণতোষবাবা সেই পিতলের পানের কৌটোর ঢাকনা খুলে, পানের খিলি পবিত্রীমায়ের মুখে পুরে দিয়েছিলেন। পবিত্রীমাও প্রাণতোষবাবার মুখে পানের খিলি পুরে দিয়েছিলেন। যোগেশ্বর ও জগতও একইভাবে পরস্পরকে পানের খিলি মুখে দিয়েছিলেন। তারপর দুই পুরুষ দুই প্রকৃতির দিকে হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, "মা, আমার মোক্ষলাভ হোক, তুমি অনুমতি দাও।"

দুই "শক্তি" দুই "শিব" কে হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করেছিলেন। দুই সাধক, দুই সাধিকাকে গভীর আলিঙ্গনে পিষ্ট করেছিলেন, এবং কোলে নিয়ে আসনে বসেছিলেন। শুরু হয়েছিল কামকলার নানা শৃঙ্গার

চুম্বন, আলিঙ্গন, বিভিন্ন অঙ্গে পরস্পরের মর্দন, চোষণ, ঘর্ষণ। সেই মুহূর্তে আমার একবার প্রাণতোষবাবার একটি কথা মনে পড়েছিল, "ঋতুযুক্তলতা মধ্যে…"। কিন্তু আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না, সাধিকারা ঋতুমতী ছিলেন কী না। সেই সময়ে সাধকদ্বয়, সাধিকাদের "দেবী, দেবেশী, শিবানী" ইত্যাদি নামে সম্বোধন করেছিলেন।

কিছুকাল সেইভাবে নানা শৃঙ্গারের পরে সাধকদ্বয় মন্ত্রোচ্চারণ করে সাধিকাদের সঙ্গে মৈথুনে রত হয়েছিলেন। তখন নানা রকমের শীৎকার, হুংকার গভীর ও দীর্ঘ নিশ্বাস টানার শব্দ হচ্ছিল। সে নিশ্বাস সাধারণ নিশ্বাস গ্রহণের ন্যায় ছিল না, বিশেষ শব্দ করে যে ভাবে নিশ্বাস নিচ্ছিলেন, তা পূরক বলেই আমার মনে হয়েছিল তারপরে কিছুক্ষণ স্তব্ধতা, যাকে কুম্ভক বলা যায় তারপরেই রেচক। রেচকের পরেই মৈথুনের তীব্রতা বাড়ছিল, এবং মাঝে মাঝেই পূরক কুম্ভক রেচক করা চলছিল। মাঝে মাঝে সাধক সাধিকার মুখের দিকে অপলক চোখে দেখছিলেন, তখন কুম্ভকের মতো নিশ্বাস বন্ধ থাকছিল, এবং তারপরেই উভয়ে হেসে উঠে আবার অঙ্গ চালনা করছিলেন।

আমি সেই সময় বিবাহিত ছিলাম, কিন্তু সঙ্গমক্রিয়ার ঐরকম ভাবের কোনো ধারণা ছিল না। সাধক পুরুষরা যেন বীর বিক্রমে পূরক কুম্ভক রেচক সহযোগে, মৈথুনক্রিয়ার ভিতর দিয়ে একটা কঠোর সংগ্রাম করছিলেন। সাধারণ রমণী বা পুরুষের সেই প্রাথমিক ক্রিয়াকালের মধ্যেই পর্যুদস্ত হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু পবিত্রীমা বা জগৎ পর্যুদস্ত হওয়া দূরের কথা, মনে হয়েছিল, তাঁরাও যেন সাধক পুরুষদের মতো সাধন সংগ্রামের অংশভাগিনী হয়ে পড়েছিলেন। শীৎকার ও নানা প্রকারের শব্দ তাঁদের গলায়ও শোনা যাচ্ছিল।

প্রাণতোষবাবার কুণ্ডলিনী জাগরণ ও তাকে উধ্বর্গামিনী করার কথা আমার মনে পড়েছিল। তাঁরা কি কুণ্ডলিনীকে উধ্বর্গামিনী করছিলেন? যোগ মৈথুনের দ্বারাই তা সম্ভব। প্রাণতোষবাবা ও

যোগেশ্বর যেন মাঝে মাঝে মন্ত্রোচ্চারণ ও করছিলেন। কতোক্ষণ সেইভাবে কেটেছিল জানি না, আমার হাতে ঘড়ি ছিল না। যদি থাকতো, দেখবার মতো মনের অবস্থা ছিল না।

এক সময়ে দুই সাধকই অঙ্গ চালনায় বিরত হয়ে, মৈথুনরত অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় সোজা হয়ে বসেছিলেন। সাধিকাদ্বয় দু পা দিয়ে সাধকদের কোমর বেষ্টন করেছিলেন। আর সাধক দুজন যেন নিশ্বাস বন্ধ করে, দুই হাতের বিশেষ মুদ্রায় সাধিকা দুজনের যোনিদেশে স্পর্শ করে কিছু জপ করছিলেন। অথবা কেবল নিশ্বাস বন্ধ না করে পুরক কুম্ভক ও রেচক করছিলেন। সাধিকা দুজন যে নিষ্ক্রিয় ছিলেন, তা মনে হয়নি তাঁদের মৃদু শীৎকার শব্দের মধ্যে, শরীরের পেশী আকুঞ্চিত হচ্ছিল, এবং তাঁরাও যেন পূরক কুম্ভক রেচক করছিলেন।

ব্যাপারটা কী ঘটছিল আমি বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, তাঁদের ক্রিয়ানুষ্ঠান বোধহয় শেষ হয়ে এলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার ভাবনাকে ভুল প্রমাণিত করে পুনরায় আরও তীব্র বেগে মৈথুনক্রিয়ার অঙ্গচালনা শুরু হয়েছিল। তার সঙ্গে শীৎকার হুংকার অদ্ভুত সব শব্দ করছিলেন।

রাত্রি কতো হয়েছিল, কিছুই অনুমান করতে পারছিলাম না। এত দীর্ঘ সময় ধরে মিলন, প্রাণায়াম, জপ ও মন্ত্রোচ্চারণ, আমার কল্পনার বাইরে ছিল। প্রাণতোষবাবার মুখে শুনেছিলাম, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না। ব্যাপারটা আমার কাছে এমনই অমানুষিক কঠিন বলে বোধ হয়েছিল, নরনারীর মিলন সঞ্জাত ক্রিয়া দর্শনের স্বাভাবিক কোনো প্রতিক্রিয়াই আমার মধ্যে ঘটবার অবকাশ পায়নি। সাধারণ কোনো দম্পতীর দৈহিক মিলন দেখলে, নিশ্চয়ই আমার শরীরে ও মনে প্রতিক্রিয়া ঘটতো। অথচ আমার সামনে সাধক সাধিকাদের পঞ্চম তত্ত্ব সাধনাটি অতি কামকলার ওপর নির্ভর-
।, তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

সাধকদ্বয় আবার অবিচ্ছিন্ন অবস্থায়, সোজা হয়ে বসেছিলেন,

এবং সাধিকা দুজন যথারীতি তাঁদের জঙ্ঘা ও দু পা দিয়ে, সাধকদের কোমর বেষ্টন করেছিলেন। সাধক দুজন তখন প্রাণায়ম সূচক নিশ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে, সাধিকা দুজনের বস্তিদেশে দু হাতের মুদ্রা করে স্পর্শ করেছিলেন, এবং জপ করেছিলেন। প্রাণতোষবাবার ষটচক্র-ভেদের কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। যে-চক্রগুলোকে তাঁরা কল্পনা করে থাকেন, শিরদাঁড়ার ভিতর দিয়ে, লিঙ্গমূল থেকে মস্তিষ্ক পর্যন্ত অবস্থিত। চক্রের স্থানগুলো তিনি আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিলেন। অতএব আমি অনুমান করেছিলাম, সুষুম্নার ভিতর থেকে কুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তুলে, তাঁরা উর্ধ্বগামিনী করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

আমি কিছু ভুল ধারণা করিনি। দুই সাধক, সাধিকাদের বস্তিদেশ অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান চক্রে জপ করে, আবার হুহুংকার শব্দে মৈথুন শুরু করেছিলেন, এবং এক সময়ে আবার স্থির হয়ে, মণিপুরে অর্থাৎ সাধিকাদের নাভিমূলে জপ করেছিলেন। সেই ভাবে ক্রমাগত হৃদয়ে, কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যে চক্রগুলোকে দুই সাধক ভেদ করেছিলেন। আমি জানি না, শেষ প্রহরের শৃগাল ডেকে উঠেছিল কী না। কিংবা চক্র সাধন সময়কে আমার অতি বিলম্বিত ধারণা হয়েছিল।

ভ্রূমধ্যকে সাধকরা 'আজ্ঞাচক্র' বলেন। তারপরেই "সহস্রার" অর্থাৎ মস্তিষ্কে, যেখানে কুণ্ডলিনী অর্থাৎ মহাশক্তির সঙ্গে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ পরম শিবের মিলন হয়। প্রাণতোষবাবা বলেছিলেন, সেই অবস্থায় সাধক তাঁর ইচ্ছাও সাধ্যমতো সময় পরমানন্দে অতিবাহিত করেন। তারপর মন্ত্রোচ্চারণ করে শুক্রত্যাগ করেন। আমি দেখেছিলাম, জগত থরথর কাঁপছিলেন। কাঁদছিলেন বা হাসছিলেন, সঠিক বুঝতে পারিনি। তাঁর পদযুগল ও দুই হাত তখন যোগেশ্বরের কণ্ঠ বেষ্টন করেছিল। তাঁকে অনেকটা বৃত্তের মতো দেখাচ্ছিল। যোগেশ্বর তাঁকে দু হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন। প্রাণতোষবাবা ও পবিত্রীমা দুটি সাপের মতো জোড়া লাগা অবস্থায় অদ্ভুতভাবে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। কখনো একজন নীচে আর একজন ওপরে থাকছিলেন। সেইভাবে কিছুক্ষণ

চলার পরে আস্তে আস্তে দুই জোড়া দেহই যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে তাঁদের গলা দিয়ে অদ্ভুত অস্ফুট শব্দ নির্গত হচ্ছিল।

আমি ভাবছিলাম, সেই কি তাঁদের ইচ্ছা ও সাধ্যমতো সময়, পরমানন্দে অতিবাহিত করা? জানি না। মাঝে মাঝে দু একটি অস্ফুট শব্দ ছাড়া, এমন কি তাঁদের নিশ্বাসের শব্দও যেন পাচ্ছিলাম না। প্রাণতোষবাবা পরে আমাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, সেই অবস্থায় সাধকদের দেহ প্রায় মৃতবৎ ঠাণ্ডা হয়ে যায়, কিন্তু মস্তিষ্ক অত্যন্ত উষ্ণ থাকে। তার পরবর্তী অধ্যায়, বিশেষ একটি মন্ত্রোচ্চারণ করে, শুক্র-ক্ষরণ। এবং তারও পরবর্তী অধ্যায়, কুণ্ডলিনীকে ধাপে ধাপে মূলাধারে নামিয়ে নিয়ে আসা।

কিন্তু তাঁরা যখন সংযুক্ত অবস্থায় অনড় নিশ্চল ছিলেন, তখন আমার চোখে যেন রাজ্যের ঘুম নেমে এসেছিল। জানি না, সেই চক্রানুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম কী না, অথবা অনেকক্ষণ মানসিক একটা ঝড়ের বেগে কেটেছিল বলেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম কী না, আমার আসনের ওপরেই ঘুমে ঢলে পড়েছিলাম। সকাল বেলা আমার যখন ঘুম ভেঙেছিল, তখন বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল।

আমি কোথায় কী অবস্থায় আছি ভাববার চেষ্টা করেছিলাম, এবং গত রাত্রের কথা মনে পড়তেই ধড়ফড় করে উঠে বসেছিলাম। অবাক চোখে দেখেছিলাম, ঘরে কোনো শয্যা বা আসন নেই। প্রদীপ ধূপদানি ফুলের পাত্র পানের কৌটা, কিছুই নেই। ছিল না সেই ঘট, যন্ত্র পট। কেবল ত্রিশূলটি যেমন থাকে, এবং দেওয়ালের এক পাশে তাকের ওপর রাখা পাঁচটি নরকরোটি, সে সবই আগের মতো ছিল। আমার নিজের মনেই যেন সংশয় জেগেছিল, গত রাত্রে আমি যা দেখেছি তা কি বাস্তবে সত্যি? কিন্তু আমার কাছে সেই চক্রানুষ্ঠানের দৃশ্য যেন স্বপ্নবৎ বোধ হয়েছিল। আমি ঘরের বাইরে বেরিয়ে ধীরু যোগীকে দেখেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন "হাত মুখ ধুয়ে নিন, আপনার চা প্রস্তুত।"

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "প্রাণতোষবাবা এবং আর সকলে কোথায়?"

ধীরু জবাব দিয়েছিলেন, "বাবা মায়েরা তো ভোরবেলাই স্নান করে নীলাচলে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে পূজা দিতে গেছেন।"

কামাখ্যা পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম নীলাচল, এবং সেখানে গর্ভগৃহে ভুবনেশ্বরীদেবী আছেন। সমস্ত রাত্রের চক্রানুষ্ঠানের পরে ভোরবেলাই স্নান করে আবার তাঁরা ভুবনেশ্বরীর মন্দির গিয়েছিলেন, ভেবে আমি অবাক হয়েছিলাম। তাঁদের কি কোনো ক্লান্তি ছিল না।

না, বরং দুপুরে তাঁদের আমি বিপরীত রূপই দেখেছিলাম। তাঁদের দেখাচ্ছিল সুখী, উজ্জ্বলতর, এবং একটি গভীর সুখের আবেশে যেন আচ্ছন্ন। তারপরেও আমি তাঁদের কাছে দুদিন ছিলাম। তখন অনেক কথার মধ্যে, প্রাণতোষবাবা আমাকে বলেছিলেন, "ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সাধন তত্ত্ব তোকে আমি প্রত্যক্ষ করিয়েছি। কিন্তু আমি আশা করবো বিষয়টি নিয়ে তুই অজ্ঞ মূর্খদের সঙ্গে কখনো আলোচনা করবি না।"

জানি না, এতকাল পরে, এই লেখার দ্বারা আমি কথার খেলাপ করলাম কী না।

কামাখ্যা পাহাড়ের ঘটনার সাত বছর পরে, কালী পূজা উপলক্ষে, আমি বর্দ্ধমানের সেই প্রান্তিক গ্রামে গিয়েছিলাম, যার এক দিকে বীরভূম, এবং গঙ্গার অপর তীরে মুর্শিদাবাদ জেলা। যে গ্রামে আমি গিয়েছিলাম, সেই গ্রামের অধিকাংশ উচ্চকোটি হিন্দুরাই শাক্ত, শক্তির উপাসক। বস্তুতঃ বর্ধমান, বীরভূম মুর্শিদাবাদ এবং বাঁকুড়া, যাকে রাঢ় অঞ্চল বলে, সর্বত্রই আমি, হিন্দু বা সহজিয়া তন্ত্র সাধনার প্রাদুর্ভাব দেখেছি। বিশেষ করে বীরভূম এবং বর্ধমান। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায়ও কম দেখিনি।

যাই হোক, বর্ধমানের সেই প্রান্তিক গ্রামে এক কৌলমার্গী তান্ত্রিক

সাধক তাঁর চক্রে আমাকে একজন 'যোগদানকারী' হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, সে-কথা আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেই সাধককে তখন আমি সামান্য একটি রেশমের ধূতি আর উত্তরীয় ব্যবহার করতে দেখেছিলাম, এবং সবাই তাঁকে "গোঁসাই ঠাকুর" বলে সম্বোধন করছিল। প্রকৃতপক্ষে আমি আদৌ একজন দীক্ষিত সাধক ছিলাম না, আমার কোনো গুরুও ছিল না। এমন কি, ইতিপূর্বে কামাখ্যা পাহাড়ে প্রাণতোষবাবার আশ্রমের অভিজ্ঞতার কথাও গোঁসাই ঠাকুরকে আমি কিছু বলিনি। তন্ত্র বিষয়ে আমি তাঁকে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। যে-কোনো কারণেই হোক, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, এবং তন্ত্র সাধনার গোপনীয়তার বিষয়ে, বেদের উল্লেখ করেছিলেন। তিনি আমাকে আরও বলেছিলেন, "আমাদের সাধনাকে 'বীরাচার' বলা চলে। সেই জন্যই আমাদের প্রতি নির্দেশ হলো, বাহ্যিক ধর্মাচরণে আমরা শৈবভাব অবলম্বন করবো। সামাজিক মেলামেশায় বৈষ্ণবোচিত বিনীত আচরণ করবো, আর সাধনকালে আমি একজন শক্তির উপাসক। শক্তির উপাসককে 'লজ্জা' 'ঘৃণা' 'ভয়' এই তিনটি প্রবৃত্তি সমূলে বর্জন করতে হবে। আমরা অন্তরে একরকম, লোকচক্ষে আর একরকম। এ সবই গোপনীয়তার জন্য। কেন না, তোমাকে বলেছি, আমাদের পঞ্চ-মকারের সাধনা দেখলে, অজ্ঞদের চোখে তা একরকমের যৌনাচার ছাড়া কিছুই মনে হবে না।"

সে বিষয়ে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল, যদিও আমি তাঁকে তা প্রকাশ করিনি। গোঁসাই ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, "আমাদের স্ত্রী পুরুষের সঙ্গম, শিব শক্তির সামরস্য, কিন্তু যোগের দ্বারা সুষুম্নায় সেই মিলন ঘটে। মহাদেব দেবীকে বলেছেন, 'দেবী, আমি শুক্র, তুমি শোণিত, আমাদের দুইয়ের থেকে নিখিল জগতের উদ্ভব হয়েছে।' বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডে যা ঘটেছে, আমাদের দেহেও একই লীলা ঘটছে কোনো তফাত নেই।"

তাঁর সেই কথা শুনে, প্রাণতোষবাবার "ভাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড" বিষয় আমার

মনে পড়েছিল। দেহকে সেইজন্য তান্ত্রিক সাধকরা অত্যন্ত পবিত্র মনে করেন, এবং মানব জন্মকে দুর্লভ বলে বিবেচনা করেন। যাই হোক, সেই গোঁসাই ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, যথা সময়ে আমাকে লোক দিয়ে সংবাদ পাঠানো হবে, আমি যেন সেই লোকের সঙ্গে চক্রে যোগদানের জন্য চলে যাই। কালীপূজার পরের দিন, সন্ধ্যায় আমাকে একজন এসে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আমি যে শাক্ত পরিবারে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে বর্ধমানের সেই প্রান্তিক গ্রামে গিয়েছিলাম, তাঁরাও ঘোর শাক্ত, কিন্তু তান্ত্রিক সাধক কেউ ছিলেন না। পূজার দিন পনরো-বিশটি ছাগ বলি এবং সমারোহ দেখেছিলাম। গৃহকর্তা আমাকে নিজেই গোঁসাই ঠাকুরের চক্রে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন।

আমার মনে নেই, কালীপূজার পরের দিনও অমাবস্যা ছিল কী না। কিন্তু আকাশে প্রথমার চাঁদ দেখতে পাই নি। সন্ধ্যাকালেই মনে হয়েছিল ঘোর অন্ধকার। প্রথম প্রহর ঘোষণা করে শিয়াল ডেকে উঠেছিল। গোঁসাই ঠাকুরের প্রেরিত গ্রাম্য লোকটি আমার হাত না ধরলে, অন্ধকারের গ্রাম্য পথে আমি আছাড় খেতে পারতাম। লোকটি আমাকে গাছপালা ঘেরা উঁচু জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, এবং আমি নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব দেখে, পাশেই বড় একটি জলাশয় অনুমান করেছিলাম। তারপরেই আমার চোখে পড়েছিল, কিছুটা দূরেই বড় এমটি অগ্নিকুণ্ডের লেলিহান শিখা ও কয়েকটি মানুষের ছায়া। আমি লোকটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "ওই আগুন কিসের?"

জবাবে লোকটি বলেছিল, ওখানে শবদাহ করা হচ্ছে, স্থানটি গ্রাম্য শ্মশান। শ্মশান শুনেই আমি চমকিয়ে উঠেছিলাম, জিজ্ঞেস করেছিলাম, আমাকে ওখানে যেতে হবে কী না। লোকটি বলেছিল, না। এবং সে আমাকে কাছেই একটি ঘরের সামনে নিয়ে গিয়েছিল। ঘন অন্ধকারের জন্যই আমি ঘরটি দেখতে পাইনি, বা সেখানে যে কোনো ঘর থাকতে পারে ভাবতেই পারিনি। ঘরের দরজা খোলা ছিল, ভিতরে আলো জ্বলছিল। দরজার সামনে দাঁড়াতেই আমি কৌলমার্গী

গোঁসাইঠাকুরকে দেখতে পেয়েছিলাম। তিনি যে আসনের ওপর বসেছিলেন, তার পাশের আসনেই প্রায় এক অশীতিপর বৃদ্ধ জটাধারী ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছিলাম। দুজনের গায়েই তখন নিম্নাংশে ও উর্ধ্বে দুই টুকরো লাল বস্ত্র জড়ানো। কপালে লাল ত্রিপুণ্ড্র আঁকা। একাধিক হারিকেন এবং প্রদীপের আলোয় আরও দেখেছিলাম, অন্য পাশে এক রক্তাম্বর মধ্যবয়স্ক পুরুষ, ও তাঁর পাশে রক্তাম্বরী এক যুবতী রমণী বসেছিলেন। ঘরের মাঝখানে খড় ছড়িয়ে তার ওপর শতরঞ্জি, শতরঞ্জির ওপরে লাল কাপড় পাতা। যেন একটি লাল রঙ বিছানা পাতা হয়েছিল। বিছানার ঠিক মাঝখানে অনেকগুলো কলাপাতা এক সঙ্গে জোড়া লাগিয়ে পাতা হয়েছিল। সাধারণতঃ গৃহস্থের বিবাহ বাড়িতে এক সঙ্গে অনেক পরিমাণ অন্ন রাখবার মতো করে কলাপাতাগুলো জড়ো করে পাতা ছিল।

গোঁসাইঠাকুর (আমার ধারণা ছিল একমাত্র বৈষ্ণব গুরুকেই গোঁসাই বলা হয়। অথচ সেই গোঁসাইঠাকুর হিন্দু তান্ত্রিক সাধক ছিলেন।) আমাকে দেখেই এবং চকিতে আমার পায়ের দিকে দেখে বলে উঠেছিলেন, "তোমার পায়ের স্যাণ্ডেল বাইরে খুলে রেখে ভেতরে এসে বস।"

আমি স্যাণ্ডেল খুলে রেখেছিলাম। তিনি হাত বাড়িয়ে ডেকেছিলেন, "এস আমার কাছে এসে বস।"

ঘরের সকলেই তখন আমার দিকে দেখছিলেন। সেই পরিবেশে ধুতি পাঞ্জাবি পরা আমার নিজেকেই বেমানান লাগছিল। লাল বিছানার পাশ দিয়ে, আমি গোঁসাইঠাকুরের পাশে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম, সেখানে পাশাপাশি কুশকাঠির কয়েকটি আসন পাতা আছে। তিনি আমাকে হাত ধরিয়ে বসিয়ে, পাশের অশীতিপর বৃদ্ধের দিকে ফিরে বলেছিলেন, "গুরুদেব, এই ছেলেটিকে আমি চক্রে যোগ দিতে বলেছি। ও দীক্ষিত নয়, তবে ওর ভেতরে একটা প্রবল ইচ্ছা আর ভক্তি আছে।"

"কিন্তু দীক্ষিত না হলে ও যোগ দেবে কেমন করে ? ওর শক্তি কে ?" গুরুদেব জিজ্ঞেস করেছিলেন।

গোঁসাইঠাকুর বলেছিলেন, "শক্তির সঙ্গে সাধনার জন্য ওকে ডাকিনি। নিতান্ত প্রদাস গ্রহণের জন্যই ডেকেছি। ও বিশেষ অনুভূতিসম্পন্ন ছেলে।"

গুরুদেব আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, আমিও তাঁর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি বলেছিলেন, "ও যদি নির্বিকার থাকতে পারে, তা হলে নিশ্চয় থাকবে। ভক্তিশুদ্ধ মনে যে কেউ চক্রে স্থান পেতে পারে।"

আমি গোঁসইঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আমি কি গুরুদেবকে প্রণাম করতে পারি ?"

গোঁসাইঠাকুর কিছু বলবার আগেই তাঁর কোলের ওপর দিয়ে, গুরুদেব তাঁর দু পা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন। আমি একটু অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু তাঁকে প্রণাম করেছিলাম। গুরুদেব পা জোড়া সরিয়ে নিয়ে আবার জোড়াসনে বসেছিলেন। তারপরে আমি গোঁসাইঠাকুরকে প্রণাম করেছিলাম। তিনি আমার মাথায় হাত স্পর্শ করে, ঠোঁট নেড়ে কিছু বলেছিলেন। সেই সময়েই ঘরে প্রবেশ করেছিলেন দুই জোড়া পুরুষ ও রমণী, যাঁদের গায়ের বস্ত্র ছিল লাল, এবং কপালে সিন্দুরের ত্রিপুণ্ড্র আঁকা। একজন পুরুষের মাথার চুল ছিল মেয়েদের মতো দীর্ঘ এবং ফাঁপানো ছড়ানো। তাঁর সঙ্গিনী রমণীর হাতে একটি ত্রিশূল ছিল। বলাবাহুল্য, সকলের গলায় ছিল রুদ্রাক্ষের মালা। কারো কারো অবিশ্যি লাল প্রবাল বা নানা রঙের পাথরের মালা, লোহা বা তামার বা রুদ্রাক্ষের তাগাও হাতে পরা ছিল। নবীন দুই জোড়া রমণী পুরুষ ঘরে ঢুকে প্রথমে অশীতিপর বৃদ্ধ ও গোঁসাইঠাকুরকে প্রণাম করে, এক পাশে কুশকাঠির আসনে বসেছিলেন। তাঁরা সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। আমি অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলাম।

তারপরেই দেখেছিলাম, কয়েকজন গ্রাম্য মানুষ বড় বড় পিতলের

ও কাঠের পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। তাদের দুজনের চার হাতে ছিল চারটি বড় বড় মাটির কলস। একজনের বাঁ কাঁধের পাশে ঝুলছিল একটা বড় ঝোলা। গন্ধেই টের পেয়েছিলাম. ভারী ওজনের কলসী চারটিতে মদ রয়েছে। একজন বিরাট একটি পিতলের গামলা উপুড় করে, বিছানার মাঝখানে রাখা কলাপাতায় ঢেলে দিয়েছিল তেল মাখা ভাজা মুড়ি, তার সঙ্গে শসা ও আদার কুচি। আর একজন একটি কাঠের বড় পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল প্রচুর ভাজা মাছ। অন্য আর একজন বৃহৎ দুই তামার হাঁড়িতে রেখেছিল রান্না করা মাংস। যে-লোক দুটি কলসী বহন করে এনেছিল, তারা বাইরে গিয়ে, আরও দুটি মদ্যপূর্ণ কলসী এনে ভোজ্য বস্তুর সামনে রেখেছিল। যে-লোকটির বাঁ কাঁধের ঝোলা ছিল, তাঁর ভিতর থেকে সে কতগুলো মেটে রঙের নরকরোটি বের করে কলসীগুলোর পাশে রেখেছিল। কিন্তু নরকরোটি সাদা হবার কথা। পরে বুঝেছিলাম, ওগুলো আসলে নারকেলের খোল, অতি সযত্নে মাজা ও মসৃণ করা। এমন সব নারকেলের খোল দিয়ে সেগুলো তৈরি করা হয়েছিল, কেবল সাদা রঙ ছাড়া বাকিটা অবিকল করোটির মতো দেখতে। নরকরোটির প্রতীক হিসাবে নারকেলের খোলের প্রচলন ছিল।

নানা খাদ্য ও পানীয় বস্তুর গন্ধের সঙ্গে, বড় ঘরটির মধ্যে যেন এক কর্মযজ্ঞ চলছিল। দুটি সাধারণ স্ত্রীলোক কয়েক ডালি ভরতি ফুল, ফুলের মালা, লাল চন্দন গোলা, এবং তেল মাখানো তরল সিঁদুর কলাপাতায় এনে রেখেছিল। একটি পিতলের বাটায় আনা হয়েছিল অনেকগুলো পানের খিলি। পুরুষেরা কেউ কেউ কলসীতে পানীয় জল, এবং লোহার বালতিতে ব্যবহারের জন্য জল রেখেছিল এক পাশে। তার মধ্যেই রক্তাম্বর রক্তাম্বরী পুরুষ রমণীরা কেউ কেউ ঘরের বাইরে ঘুরে আসছিল। অনুমান করতে পারছিলাম, বাইরে বেশ কিছু নরনারীর সমাবেশ ঘটেছে।

এই সব ব্যবস্থাদির পরেই, ঘরে প্রবেশ করেছিল এক অতুলনীয়া

কৃষ্ণাঙ্গী কন্যা, যার বয়স উপস্থিত সকল যুবতীর তুলনায় অনেক কম। আমার ধারণায় সে ছিল অষ্টাদশী। অতুলনীয়া বললাম এই কারণে, তার উদ্ধত বক্ষ, ছিপছিপে শরীরের সুষমায় যেন এক আশ্চর্য অলৌকিকতা ঘিরে ছিল। অনেকটা প্রতিমার মতোই তার দুই চোখ আকর্ণ বিস্তৃত, উন্নত নাসায় পাথরের নাকছাবি। পাখির খোলা ডানার মতো দুই ভুরুর মাঝখানে বড় একটি সিন্দুরের ফোঁটা, কিন্তু সিঁথেয় সিঁদুর না থাকায় বুঝেছিলাম, সে অবিবাহিতা। সামান্য একটি চওড়া লালপাড় শাড়ি ছাড়া আর কোনো বস্ত্র ছিল না তার গায়ে। এমন কি কোনো অলংকার বা রুদ্রাক্ষের মালাও তার গলায় ছিল না। কেবল দু পায়ে চওড়া করে আল্‌তা পরা ছিল। কুঞ্চিত কেশদাম পিঠে ও ঘাড়ে ছড়িয়ে ছিল। কোমরের কাছ থেকে তার পিঠের শিরদাঁড়া যেন অনেকটা ধনুকের মতো বাঁকা, আর সেই কারণেই তার বুক যেন পায়রার বুকের মতো সামনে উদ্ধত দেখাচ্ছিল, এবং তার নিতম্বও ছিল বুকের মতোই চওড়া ও সুঠাম। আমার অভিজ্ঞতায় সচরাচর সেই রকম দেহ সৌষ্টব উচ্চ বর্ণের নারীর থেকে, নিম্নবর্ণের নারীদেরই বেশি দেখা যায়। পরে জেনেছিলাম, সে চণ্ডাল কন্যা।

অষ্টাদশী ঘরে ঢুকে প্রথমে গোঁসাইঠাকুরের গুরুদেবকে, এবং পরে তাঁকে প্রণাম করেছিল। গুরুদেব দু হাত বাড়িয়ে মেয়েটির হাত ধরে তাঁর আর গোসাইঠাকুরের মাঝখানে বসিয়েছিলেন, বলেছিলেন, "আয় মা, শক্তিরূপিণী মা, তুই এখানে বোস।"

স্বভাবতই আমাকে পাশের আসনে সরে বসতে হয়েছিল। অন্যান্য সাধক সাধিকা সকলেই চিকন কালো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, সেই চক্রে মেয়েটির কী ভূমিকা থাকতে পারে। সে ছিল নীরব, যেন গভীর চিন্তামগ্ন, অথবা সম্মোহিত। কোনোরকম বয়সোচিত চঞ্চলতা ছিল না। তাকে দেখে, কামাখ্যা পাহাড়ের জগত সাধিকার কথা আমার মনে পড়েছিল, যদিও জগতের তুলনায় সে ছিল অল্প বয়স্কা এবং তার কালো রূপও ছিল অনেক উজ্জ্বল।

যারা ভোজ্য পানীয় ও অন্যান্য দ্রব্য বহন করে আনছিল, তাদের মধ্যে একজন গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, "বাবা, পূজার সব সামগ্রী আনা হয়ে গেছে।"

গুরুদেব বলেছিলেন, "তা হলে তোমরা এবার সবাই বাইরে যাও। আমরা শুরু করি।"

সকলেই বাইরে চলে গিয়েছিল। আমাকে বাদ দিলে ঘরে ছিলেন তিন জোড়া সাধক সাধিকা গুরুদেব, গোঁসাইঠাকুর এবং সেই কৃষ্ণাঙ্গী তরুণী। গোঁসাই ঠাকুর ডান দিকে উপবিষ্ট সাধক পুরুষকে সম্বোধন করে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "অভয়, তুমি দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দাও।"

অভয় নামে সাধক তাঁর সাধিকার পাশ থেকে উঠে দরজার খিল ভিতর থেকে বন্ধ করেছিলেন। গুরুদেব উঠে লাল কাপড় পাতা বিছানার ওপর, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্যের সামনে গিয়ে বসেছিলেন, এবং বলেছিলেন, "সবাই এগিয়ে এসে বসো। মায়েদের মধ্যে কেউ করোটিগুলো সকলের হাতে হাতে তুলে দাও, নিজেরাও নাও।"

গুরুদেবের কথা মতো সবাই পানীয় ও খাদ্যবস্তুর সামনে গিয়ে বসেছিলেন। গোঁসাইঠাকুর আমাকেও হাত ধরে তাঁর পাশে নিয়ে বসেছিলেন। তাঁর আর গুরুদেবের মাঝখানে বসেছিল সেই দ্যুতিময়ী তরুণী। একজন সাধিকা নরকরোটির প্রতীক সেই নারকেলের খোল সকলের হাতে হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমাকেও দেওয়া হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কি, আমি মনে মনে অস্বস্তিবোধ করছিলাম। গুরুদেব তখন তাঁর গলার দীর্ঘ উপবীত হাতে নিয়ে, বিশেষ মুদ্রায় সমস্ত পানীয় ও ভোজ্যদ্রব্য স্পর্শ করেছিলেন। সেই প্রথম আমার লক্ষ পড়েছিল, তাঁর এবং গোঁসাইঠাকুর ছাড়া, কোনো পুরুষের গলায় উপবীত নেই। আমাকে গোঁসাইঠাকুর নীচু স্বরে বলেছিলেন, "গুরুদেব সমস্ত পানীয় আর খাদ্য শোধন করে দিচ্ছেন। অশোধিত কিছুই আমরা গ্রহণ করি না। এমন কি অদীক্ষিত 'শক্তি'-কেও শোধন করে নিতে হয়, অভেদজ্ঞানে মায়াবীজ তার কানে ঢুকিয়ে

দিয়ে। এই যে দেখছো আমার পাশে মেয়েটি, ওর নাম 'তারা'। ও চণ্ডাল পরিবারের কুমারী, শক্তি হিসাবে অতি উত্তমা। 'তারা' অদীক্ষিত, ওকেও শোধন করে নিতে হবে।...এইবার তুমি ঠিক আমার মতো করে নারকেলের খোলটি ধর।"

দেখেছিলাম, তিনি বাঁ হাতের তালুতে ডান হাত রেখে, মধ্যম এবং অনামিকা আঙুল দুটি মুড়েছিলেন, এবং তার মাঝখানে রেখেছিলেন নারকেলের খোল। সেইরকম মুদ্রা আমি প্রাণতোষবাবার আশ্রমেও দেখেছিলাম। আমি গোঁসাইঠাকুরকে অনুকরণ করেছিলাম, এবং সকলেই একভাবে নারকেলের খোল হাতে নিয়েছিলেন। গুরুদেব স্বয়ং একটি মাটির গেলাস দিয়ে, কলসী থেকে মদ তুলে, সকলের পাত্রে পাত্রে ঢেলে দিয়েছিলেন। আমার অনুমান, প্রত্যেক পাত্রে মদের পরিমাণ দুটি লার্জ পেগের কম ছিল না। তারপরে গুরুদেবও তাঁর পাত্রে মদ ঢেলে, হাতে নিয়ে, একটা কিছু উচ্চারণ করেছিলেন, এবং সকল সাধক সাধিকা এক সঙ্গে পাত্র উজাড় করে গলায় ঢেলে দিয়েছিলেন। এমন কি তারাও। আমিই কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্তব্ধ ছিলাম, কারণ এক সঙ্গে সেই পরিমাণ মদ গলায় ঢালতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। গোঁসাইঠাকুর সচকিত হয়ে বলেছিলেন, "একি, থেমে আছো কেন, শীঘ্র পান কর।"

ক্রিয়াবিশেষের নিয়মভঙ্গের আশঙ্কায় আমি তাড়াতাড়ি পাত্র তুলে গলায় ঢেলে দিয়েছিলাম। তারপর সকলেই মাছ মাংস ও মুড়িভাজা হাতে তুলে খেতে আরম্ভ করেছিলেন। গ্রামে তৈরী তীব্র মদের ঝাঁজে আমার গলা বুক জ্বালা করছিল। খাবার মুখে দিয়ে স্বস্তিবোধ করেছিলাম। সেইভাবে তিন প্রস্থ মদ্য পান ও মৎস্য মাংস আহারের পরে, আমি আর মদ্য পানে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমার রক্তে দ্রুত ক্রিয়া শুরু হয়েছিল, ঘামতে আরম্ভ করেছিলাম। গোঁসাইঠাকুর নিজেই আমাকে বলেছিলেন, "না পারলে, আর পান করো না, খাবার খাও।"

সাধিকারা সকলেই পাঁচ পাত্র পর্যন্ত পান করেছিলেন। সাধকরা অধিকাংশই একাদশ পাত্র পর্যন্ত, কেবল একজন তেরো পাত্র পান করেছিলেন। ভোজ্যবস্তু সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। আমার কাছে লক্ষণীয় ছিল, চক্রে জাতিভেদের কোনো ব্যাপারই ছিল না। সকলেই এক পাত্র থেকে পানীয় ও খাদ্য নিয়েছিলন। পান ভোজনের পরে সাধক সাধিকারা নিজেরাই কলাপাতা এবং মদের কলসীগুলো ঘরের এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন, এবং সকলের সঙ্গে আমিও, একটি কাঁচা নর্দমার মুখে হাত মুখ ধুয়েছিলাম। পানীয়র গুণে সকলের মধ্যেই একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, অবিশ্যি চোখে মুখের অভিব্যক্তিতে। কেউ কেউ 'মা মা!' বলে ডেকে উঠছিলেন। একজন গেয়ে উঠেছিলেন, "সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাই জয় কালী! বলে।"...

তারপরেই সকলে জোড়ায় জোড়ায় আসন করে বসেছিলেন লাল কাপড় বিছানো শয্যায়। গোঁসাইঠাকুর আমাকে একটু দূরে কুশ-কাঠির আসনের ওপর বসবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমি লাল শয্যার বাইরে কুশকাঠির আসনে গিয়ে বসেছিলাম। গুরুদেব বললেন, 'হারিকেনগুলো সব নিভিয়ে দাও, কেবল প্রদীপগুলো জ্বলুক।'

একজন সাধক উঠে দুটো হারিকেন নিভিয়ে দিয়েছিল। পাঁচটি প্রদীপ জ্বলছিল। তার আলো কিছু কম না। কামাখ্যায় প্রাণতোষবাবার ঘর যেমন একটা আবছা আলো আঁধারের ভাব ছিল, তার থেকে এ ঘরে সবই স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। গুরুদেব ডাকলেন, 'তারা মা, আয় তোকে দীক্ষা দিই।'

সেই কৃষ্ণাঙ্গী যুবতী গুরুদেবের কাছে আরও এগিয়ে গিয়েছিল। যাঁরা মা মা ডাকছিলেন, বা গান করছিলেন, সকলেই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। গুরুদেব সেই কৃষ্ণাঙ্গী যুবতীর কানের কাছে মুখ নিয়ে, কিছু বলেছিলেন, যার এক বর্ণও আমি শুনতে পাইনি। গোঁসাই ঠাকুরের কথা আমার মনে পড়েছিল। অদীক্ষিতা শক্তিকেও শোধন

করে নিতে হয়। গুরুদেব কি তারাকে শোধন করছিলেন? প্রায় মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে কেটেছিল। তারা নামে ( অবিশ্যি সেই চণ্ডাল কন্যাটির নাম তারা নয়। ) অষ্টাদশীর মুখে একটি ভাবান্তর হয়েছিল। তার চোখ বুজে গিয়েছিল, নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়েছিল। বুকের লালপাড় শাড়ির আঁচল খসে পড়েছিল, আর পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্ট পাথরের মূর্তির মতোই তার সুগঠিত কুচযুগ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল। গুরুদেব মাথা নত করে তাকে প্রণাম করেছিলেন। তারা নির্বিকার ছিল। এটা বিস্ময়ের বিষয়, একজন অশীতিপর ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ একটি চণ্ডাল তরুণীকে প্রণাম করছেন। তন্ত্রধর্মেই বোধহয় এমন সম্ভব। তারপরেই গুরুদেব বলেছিলেন, 'বাবারা তোমরা এবার মাতৃঅঙ্গে ন্যাস কর।'

কথাটা আমার কানে নতুন শোনালেও, দেখেছিলাম, মাতৃঅঙ্গন্যাস আসলে, 'শক্তি' রমণীদের শরীরকে নানা ভাবে পূজা করা, যা দেখেছিলাম কামাখ্যায় প্রাণতোষবাবার সাধনার সময়ে। বর্ণনা দিতে গেলে, অনেকটাই পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা। সেখানেও সাধক সাধিকারা সকলেই নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সাধকরা সাধিকাদের কপালে সিন্দুরের ত্রিকোণ যন্ত্র এঁকে দিয়েছিলেন। তারপরে পা থেকে নাভিস্থল পর্যন্ত, নাভি থেকে স্তন পর্যন্ত, স্তন থেকে মাথা পর্যন্ত, ফুল চন্দন ইত্যাদি দ্বারা পূজা করেছিলেন। সকলের ঠোঁট নড়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল, তাঁরা কোনো মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন।

লক্ষণীয় যেটা, দেখেছিলাম, সেই অশীতিপর বৃদ্ধ গুরুদেব নগ্ন তারাকে একইভাবে পূজা করেছিলেন। আমি যথেষ্ট সংযত ও স্থির থাকা সত্বেও, স্বীকার না করে পারছি না, আমার দৃষ্টি বারেবারেই তারার দিকে পড়ছিল। একমাত্র তারাই সাধিকাদের মধ্যে চোখ বুজেছিল, বাকি সাধিকারা স্থির থাকলেও, চোখ খোলাই ছিল। আরও যেটা লক্ষণীয় ছিল, গোঁসাইঠাকুর একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে নিশ্চল বসেছিলেন। বুঝতে পারছিলাম না, তিনি কি তবে এই চক্র সাধনা

থেকে বিরত থাকছেন ? আমার প্রশ্ন করার কোনো উপায় ছিল না। বরং বৃদ্ধ গুরুদেবকে তরুণের ন্যায় দেখে অবাক হচ্ছিলাম। অর্থাৎ তাঁর অঙ্গটি তরুণের ন্যায় উচ্ছ্রিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রাণতোষ-বাবার সাধন প্রকরণে, এই অনুষ্ঠানটি যতোক্ষণ সময় নিয়েছিল, এখানে তার থেকে অনেক কম সময় ব্যয় হয়েছিল। আমাকে বলা হয়েছিল, এটি ভৈরবীচক্র। পরস্পরকে পানের খিলি মুখে পুরে দেওয়ার মধ্যে মিল ছিল। পান চিবোতে চিবোতেই সাধকরা সাধিকাদের পায়ের কাছে বসে প্রণাম করেছিলেন। তারপরেই শুরু হয়েছিল শৃঙ্গার। আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তন মর্দন ও পরস্পরের যৌনাঙ্গে চোষণ শোষণ। তার সঙ্গে নানা শব্দ, যা হাসি ও উল্লাস ছাড়া কিছু মনে হয়নি। এমন কি, সাধক সাধিকারা প্রেম গদ্‌গদ স্বরে, পরস্পরকে নানা ভাষায় প্রশংসা করছিলেন। শুনতে অবাক লাগলেও, সেই সব ভাষার কয়েকটি অশ্রাব্য বলেই আমার মনে হয়েছিল।

গুরুদেব মাঝে মাঝে কিছু বলে উঠছিলেন। বাকিরা অট্টহাস্য করছিলেন, এবং অদ্ভুত কোনো শব্দ উচ্চারণ করছিলেন, যা আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। তিনি তারার সর্বাঙ্গ লেহন করছিলেন, বিশেষ ভাবে, তাঁর নিজ ভাষায়, 'এই কামপীঠ দেবদুর্লভ' বলে বারে বারে জিহ্বার দ্বারা স্পর্শ করছিলেন। আমার মাতৃভাষায় সব ক্রিয়াগুলোর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা দিতে আমি অক্ষম।

শৃঙ্গারাদির পরেই, মন্ত্রোচ্চারণের দ্বারা মৈথুন ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। গুরুদেবও বিরত থাকেন নি। অথচ গোঁসাইঠাকুর তেমনই চোখ বুজে স্থির ধ্যানস্থ হয়ে বসেছিলেন। তারাকে অনেকটা নির্বিকার দেখাচ্ছিল। সাধিকারা কেউই তেমন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন না। গুরুদেব তারার সঙ্গে মৈথুনে রত হয়েও, অচঞ্চল স্থির হয়ে, বারে বারেই কিছু মন্ত্রোচ্চারণ করছিলেন, আর ধীরে অঙ্গ সঞ্চালন করছিলেন। অন্যান্য সাধকরাও প্রমত্ত মৈথুনে লিপ্ত হলেও, মাঝে মাঝেই নিশ্চল হয়ে, নিশ্বাস টেনে নিয়ে স্থির হয়ে যাচ্ছিলেন। এক জোড়া

সাধক সাধিকা বিপরীত বিহার করছিলেন, এবং সাধিকাটি সামনে কলসী থেকে, নারকেলের খোলে মদ তুলে, নিজে পান করছিলেন, সাধকের মুখেও ঢেলে দিচ্ছিলেন। দৃশ্যটি আমার কাছে অভাবিত মনে হয়েছিল। পরে শুনেছিলাম, ভৈরবীচক্রে ঐ রকম অবস্থায় পান নিষিদ্ধ না।

গুরুদেবের গলা থেকে নানাবিধ শব্দ ক্রমেই বেশি শোনা যাচ্ছিল। অথচ তাঁকে শান্তই দেখাচ্ছিল। মাঝে মাঝে 'তারা তারা!' ডেকে তারার দুই চোখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তারাও তাঁর চোখের দিকে তাকাচ্ছিল। অনধিক এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই, গুরুদেব কিছু উচ্চারণ করলেন, এবং তারাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরলেন। তারার শরীর যেন কেঁপে উঠলো, মাত্র ক্ষণিকের জন্য। তারপরেই গুরুদেব তারার কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করে, তাকে দু হাতে তুলে বসালেন। ডাকলেন, 'সৌরীন্দ্র।'

গোঁসাইঠাকুরের নাম যে সৌরীন্দ্র, সেই আমি প্রথম শুনেছিলাম। তিনি চোখ খুলে বললেন, 'আদেশ করুন গুরুদেব।'

'তুমি এই মহাশক্তি অঙ্গে ন্যাস কর।' তারাকে দেখিয়ে বললেন, এবং তারাকে বললেন, 'উঠে দাঁড়া মা।'

তারা উঠে দাঁড়ালো। সৌরীন্দ্র গোঁসাইও উঠে দাঁড়ালেন। নিজেকে বিবস্ত্র করলেন, এবং সকলের মতো, তারাকে মাথা পর্যন্ত যথাবিহিত চন্দন ফুল ইত্যাদি দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণও পূজা করলেন। গুরুদের উঠে দাঁড়ালেন, সৌরীন্দ্র গোঁসাইকে কোমর জড়িয়ে ধরে নিজের নিম্নাঙ্গের সঙ্গে জাপটে ধরে বললেন, 'ওঁ শিবায় নমঃ।' গোঁসাইও উচ্চারণ করলেন, 'ওঁ শিবায় নমঃ।' তারপরেই তিনি তারার মুখে পানের খিলি পুরে দিলেন। তারাও দিল। এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে দুজনের মধ্যে চুম্বন মর্দন দংশন চোষণ শোষণ ইত্যাদি শুরু হলো।

ঘটনাটা আমার কাছে অভাবিত ছিল। গুরুদেবও গোঁসাইয়ের

কোমর জড়ানো আলিঙ্গনের বৈশিষ্ট্য কি, বা একই সাধিকার সঙ্গে দুই সাধকের চক্রে যোগদান ঘটতে পারে বলে আমার জানা ছিল না। পরে শুনেছিলাম, চক্রে ঐ রকম ঘটনা নিষিদ্ধ না। গুরু যদি বৃদ্ধ হন, অথচ চক্রে বসে সাধনা করেন, তা সার্থক হলেও সীমিত হতে বাধ্য। তখন তিনি তাঁর শিবতঃ শিষ্যকে দান করে সেই সাধিকার সঙ্গে সাধনায় লিপ্ত হতে অনুমতি দেন। অবিশ্যই সাধিকার অনুমতি থাকা চাই। দেখেছিলাম, তারার অনুমতি ছিল।

আগেই বলেছি, গোঁসাইঠাকুর বয়স্ক হলেও, তাঁর ছিল উজ্জ্বল স্বাস্থ্য। নিশ্চয়ই তাঁর বয়স ষাটের উপর ছিল। তাঁর শরীরের পেশিসমূহ, চওড়া রক্তাভ বুক, সবই ছিল, শক্ত ও দৃঢ়। আর সকলের তুলনায় তাঁকে দেখাচ্ছিল, যেন গভীর একাগ্রতায় এক কঠিন কাজে লিপ্ত হচ্ছেন। তিনি তাঁর দুই পা দু দিকে এত দূরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, মনে হচ্ছিল, কোনো মানুষের পক্ষে তা সম্ভব না। সাধারণ মানুষের পক্ষে দুই জঙ্ঘার সংগমস্থল বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার কথা। যেন তাঁর হাড় নেই, অতএব ভাঙবারও কিছু নেই। এরকমটি আমি পৃথিবী বিখ্যাত এক ব্যালেরিনাকেই করতে দেখেছিলাম। সেই অবস্থায় গোঁসাই তাঁর হাঁটু মুড়েছিলেন, এবং তারাকে পুতুলের মতো দু হাতে নিয়ে, কোলের মাঝখানে বসিয়েছিলেন। অস্পষ্ট উচ্চারণে কোনো মন্ত্রোচ্চারণ করেছিলেন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, পঞ্চ 'ম' কারের ক্রিয়া শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ মৈথুন, এবং শুরুতেই তাঁর আসন ভিন্ন, অনেকটা প্রাণতোষবাবার মতো বসা অবস্থায়। অঙ্গ সঞ্চালনের সময় মনে হচ্ছিল, তিনি যেন নাচছেন, এবং তাঁর সঙ্গে তারাও নাচছে।

কিন্তু একটানা কিছুই চলছিল না। কিছুক্ষণ পরে পরেই একেবারে স্থির হয়ে, তারার শরীরের নানা অংশে দু হাত রেখে জপ করছিলেন। অঙ্গসঞ্চালন ও জপ, দুই-ই চলছিল। আমার সামনে চার জোড়া সাধক সাধিকা চক্র সাধক করছিলেন। আমার দৃষ্টি বারেবারেই গোঁসাই

ও তারার দিকে বেশি আকৃষ্ট হচ্ছিল। গুরুদেবের সঙ্গে সাধনায় সময় তারাকে যতোটা নির্বিকার দেখেছিলাম, গোঁসাইয়ের সাধন সময়ে তাকে ততোটা নির্বিকার দেখাচ্ছিল না। অথবা সেটা আমারই দৃষ্টিবিভ্রম হতে পারে। গোঁসাই মাঝে মাঝে এমন হুংকার দিয়ে উঠছিলেন, যেন তিনি কারো সঙ্গে লড়াই করছিলেন, এবং প্রতিপক্ষকে গর্জন করে ধমক দিচ্ছিলেন।

আমি একজন সাধারণ মানুষ, যার সব রকমের ইন্দ্রিয়াসক্তিই আছে। চোখের সামনে এরকম ঘটনা দেখলে, মন অবিকৃত থাকা সম্ভব না। কিন্তু সমস্ত ঘটনাটিই এমনভাবে ঘটছিল, আমার সাধারণ প্রবৃত্তি-গুলো আদৌ কোনো চঞ্চলতা বোধ করছিল না, বরং ঘটনার বৈচিত্র্য আমাকে যেন বিমূঢ় করে দিচ্ছিল। সম্ভবতঃ মাঝে মাঝেই এঁদের প্রস্তরবৎ স্থির হয়ে যাওয়া, জপ তপ মন্ত্রোচ্চারণ, সাধিকার শরীরের নানা অংশে হাতের আঙুলের নানা ভঙ্গিতে স্পর্শ, অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণ, আবার দৈহিক ক্রিয়া আমার কাছে অনেকটা রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় দৃশ্যের মতো লাগছিল।

রাত্রি কতো হয়েছিল জানি না। একে একে তিন জোড়া সাধক সাধিকা একেবারেই মৃতবৎ হয়ে গিয়েছিলেন। গোঁসাইঠাকুর এবং তারার সাধনা কতো সময় ধরে চলেছিল, আমার কোনো হিসাব ছিল না। দুজনের মৈথুন ক্রিয়ার আসনও একরকম ছিল না। গোঁসাই ঠাকুর একবার দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তারা তাঁর গলা জড়িয়ে দু পা দিয়ে তাঁর কোমর বেষ্টন করছিল। বিচ্ছিন্ন হবার কোনো প্রশ্নই ছিল না।

রাত্রি বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছিল। আমি ঘরের ভিতর থেকে কাক ও দু একটি অন্য পাখির ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। আমি অবসন্ন বোধ করলেও ঘুমোইনি। গোঁসাইকে শিবত্ব দান করার পরে, গুরুদেব জোড়াসনে চোখ বুজে বসেছিলেন। যেন জপ করছিলেন। গোঁসাইঠাকুর একবার মা মা বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, তারপরে

তারার সঙ্গে শয্যায় আসন করে, গাঢ় সংস্পৃষ্ট আলিঙ্গিত অবস্থায় স্থির হয়ে গিয়েছিলেন। গুরুদেব চোখ খুলে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "তুমি কিছু চাও ?"

আমি কী চাইতে পারি ? আমি যা দেখতে চেয়েছিলাম, তা দেখা হয়েছিল। বলেছিলাম, না, আমি কিছু চাই না।"

"তা হলে তুমি দরজা খুলে বাইরে যাও।" তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

আমি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে দেখেছিলাম. তখনও ভোরের আলো স্পষ্ট হয় নি, তবে রাত্রি শেষ হয়ে এসেছিল। দরজার বাইরে সেই সব নরনারীরা অপেক্ষা করছিল, যারা রাত্রে পানীয় ভোজ্য এবং ফুল ইত্যাদি এনে দিয়েছিল। তারা সকলেই আমার দিকে বিশেষ উৎসুক চোখে তাকিয়েছিল। আর সেই লোকটিও ছিল যে-আমাকে রাত্রের অন্ধকারে এখানে নিয়ে এসেছিল। সে নিজেই আমাকে বলেছিল,"চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

আমি তার সঙ্গে গিয়েছিলাম। সে আমাকে বাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে, হঠাৎ আমার সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে, কাতর স্বরে বলেছিল, "আপনি যে প্রসাদ পেয়েছেন, তার এক টুকরো আমাকে দিন।"

প্রসাদের আবার টুকরো কিসের ? আমি বলেছিলাম, "প্রসাদ যা পেয়েছিলাম, তা তো খেয়ে নিয়েছি। আর কোনো প্রসাদ তো আমার কাছে নেই।"

লোকটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, "যে-কাপড়ের ওপর চক্র সাধন হয়েছে, আপনি কি সেই কাপড়ের টুকরো একটুও পান নি ?"

আমি আরও অবাক হয়ে বলেছিলাম, "না তো। কেন ?"

লোকটি হতাশ বিস্ময়ে বলেছিল, "আপনি আসল বস্তু সিদ্ধবস্ত্রই নেন নি ? আশ্চর্য !" সে দৌড়ে চলে গিয়েছিল।

পরে জেনেছিলাম সাধক সাধিকারা যে শয্যায় চক্রানুষ্ঠান করেন,

সেই শয্যার কাপড়কে 'সিদ্ধবস্ত্র' বলে, এবং তা সংগ্রহ করার জন্য সবাই ব্যাকুল হয়। গুরুদেব বোধহয় সেই জন্য জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি কিছু চাই কী না। ঐ বস্ত্র নাকি লোকের অনেক কামনা সিদ্ধ করে।

তন্ত্র সম্পর্কে আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা বললাম। এ ছাড়াও কিছু কিছু ছোটখাটো ঘটনা আমি দেখেছি। কিন্তু সে সব আমি আর আপাততঃ বলছি না। বাংলাদেশের বাউলদের সম্পর্কে দু একটি ঘটনার কথা বলে আমি এ নিবন্ধের শেষ করবো।

বহুকাল থেকেই বাউলদের গান শুনেছি। তাদের একতারা, ডুগি বা প্রেমজুরি বাজিয়ে নেচে নেচে গান গাওয়া আমাকে বরাবরই মুগ্ধ করেছে। গানের কথাগুলো সব মানে বুঝতে পারতাম না। যেটুকু বুঝতাম, তা খুবই ভালো লাগতো, বাউলের ধর্ম কী, কে এদের দেবতা এসব প্রশ্ন আমার মনে কখনো জাগেনি। আর চল্লিশ দশক পর্যন্ত বাউলদের আমি এক শ্রেণীর বৈষ্ণব বা কৃষ্ণ ভক্ত মনে করতাম। কিন্তু তাদের গানের অনেক কথাই আমার কাছে অর্থহীন বলে মনে হতো। রবীন্দ্রনাথের বাউল সুরের গান শুনেও আমার ধারণা ছিল ওগুলোও বাউল গান কিন্তু দুর্বোধ্য বা অর্থহীন না।

১৯৫১ সালে, আমি প্রথম বীরভূমের কেন্দুলি গ্রামে যাই। উপলক্ষ বাংলা পৌষমাসের শেষ দিন সেখানে বাউলদের সমাগম হয়। কবি জয়দেবকে তারা তাদের আদি গুরু মনে করে। তাঁরই স্মারক উৎসবে বাউলরা সেই দিনটিতে সেখানে সমবেত হয়। কারণ জয়দেব ছিলেন, অজয় নদের ধারে কেন্দুবিল্ব বা কেন্দুলির অধিবাসী। কেন্দুলির বাউল সমাবেশ দেখে, আমি খুবই আনন্দিত ও উৎসাহী হয়েছিলাম। দু একটি সাময়িক বড় আচ্ছাদন দিয়ে তৈরি আখড়া ছাড়া, অধিকাংশ বাউল পুরুষ ও রমণীরা নানা জায়গায় গুচ্ছ গুচ্ছ হয়ে বসেছিল, আর

গান চলছিল। পুরুষদের মাথায় পাগড়ি, গায়ে আলখাল্লা কোমরে কাপড়ের বন্ধনী। অনেকের পায়ে ঘুংগুর বাঁধা। হাতে একতারা, কোমরের বন্ধনীর সঙ্গে ঝোলানা বাঁয়া বা ডুগি। মেয়েদের পোশাক প্রধানতঃ গেরুয়া বা সাদা লাল পাড় শাড়ি, হাতে খুঞ্জনি বা প্রেমজুরি, যা দিয়ে তারা তাল দিয়ে পুরুষদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করে।

অনেক বাউলই আত্মহারা আবেগে নেচে নেচে গান করে। নানা ভঙ্গির নাচ যাকে বিশেষ কোনো ক্লাসিক পর্যায়ের বলা যায় না। অনেকটা যেন শিশুর মতো, নাচে মত্ত, কখনো কখনো ক্ষ্যাপার মতো লাফিয়ে, দু হাত তুলেও নাচে। বেশ বোঝা যায়, তারা কারোকে নাচ দেখানোর জন্য নাচে না, বা শোনাবার জন্য গায় না। নিজেদের গানে নাচে, নিজেরাই মত্ত, নিজেরাই নিজেদের আলিঙ্গন করে আনন্দ প্রকাশ করে। আবার কেউ একজনকে প্রণাম করলে, আর একজন তাকে তৎক্ষণাৎ প্রণাম করে। তরুণ বৃদ্ধ তরুণী বৃদ্ধা, সবাই সবাইকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে। এরকম আমি আর কোথাও দেখি নি। অনেক আড্ডাতেই গাঁজার আসর বেশ জমে উঠেছিল।

আমি ঘুরে ঘুরে কয়েকটি আড্ডাতে বসে গান শুনেছি। আসর প্রধানতঃ রাত্রেই বসে। সারা রাত্রি ধরে চলে। আমি আলাপ জমাবার চেষ্টা করি। একটি আড্ডায়, একজন বাউল আমাকে গাঁজার কলকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কেবল গান শুনছেন বাবা, একটু দম দিয়ে নিন।'

আমি প্রথমে একটু দ্বিধা করলেও পরে গাঁজার কলকেয় টান দিলাম, আর আমার গাঁজা টানা দেখে, আড্ডার মেয়ে পুরুষরা সবাই হেসে উঠলো। নিজেদের মধ্যেই বলাবলি করলো, 'বাবুটি গাঁজা টানতে শেখে নি, তাই সিগারেটের মতো কলকে টানছে।'

জিজ্ঞেস করলাম, আমি তাদের কোনো সেবায় লাগতে পারি কী না। জবাবে একটি তরুণী হেসে বললো, "মিষ্টি খেলে, গাঁজার নেশা জমে। কিন্তু আমরা তো গাঁজায় দম দিই না। মিষ্টি এলে, আমরাও একটু খেতে পারি।"

যদিও মেয়েরা কেউই গঞ্জিকা সেবন করছিল না। আমি মেলার অন্য দিকে গিয়ে, খাবারের দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে এনেছিলাম। দেখলাম, সকলেই খুব খুশি। একজন বাউল আমার মুখেও মিষ্টি তুলে দিল।

একটা কথা বলা দরকার। অধিকাংশ বাউলেরই মুখে গোঁফ দাড়ি, মাথায় মেয়েদের মতো বড় বড় চুল। মাথার ওপরে ঝুঁটি করে বাঁধা, তার ওপরে পাগড়ি জড়ানো। আড্ডাগুলোতে আলো তেমন নেই। সামান্য একটা হারিকেন। অথবা গ্রামে তৈরি এক ধরনের ছোট চৌকো লণ্ঠন। কোনো কোনো আড্ডায় একেবারেই আলো নেই। মেলার দোকানপাটের চারদিকের আলো, মোটামুটি একটা আবছায়ার সৃষ্টি করেছে।

সন্ধ্যা থেকে বাউলদের নানা আসরে ঘুরতে ঘুরতে, রাত্রি দশটা নাগাদ, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন এক বৃদ্ধ বাউল। মাথায় জটা, পাগড়ি নেই। ধূসর গোঁফদাড়ি মুখে। গায়ে আলখাল্লা। একতারা আর ডুগি বাজিয়ে গান করছেন। তাঁকে ঘিরে রয়েছে দশ বারো জন বাউল পুরুষ ও রমণী। প্রথমেই একটা কথা বলা দরকার। আজকাল আমরা শহরে, রেডিও বা রেকর্ডে যে-ধরনের বাউল গান শুনি, সেখানে আমি সেরকম গান শুনি নি। গানগুলো গাওয়া হচ্ছিল যেন কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গিতে। যেন বিশেষ কোনো কথা গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হচ্ছিল, আর বাকিরা জয় গুরু জয় গুরু বলে উল্লাসে চিৎকার করছিল। অথচ কথাগুলোর মানে বুঝতে পারছিলাম না।

সেই বৃদ্ধ বাউল গানের প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে, কখনো চোখের ভঙ্গি করছিলেন, হাসছিলেন, হাতের ইশারা করে মাথা ঝাঁকাচ্ছিলেন, আর বসে বসেই কোমর ও শরীর দুলিয়ে, হঠাৎ যেন একটা ঘোরের মধ্যে কেঁদে উঠছিলেন। বাকিরাও হেসে কেঁদে 'জয়গুরু' ধ্বনি দিচ্ছিল। এক সময়ে বৃদ্ধ বাউল হাতের ইশারায় আমাকে তাঁর কাছে ডেকে বসালেন। গায়ে হাত দিয়ে কোথা থেকে এসেছি, জিজ্ঞেস

করলেন। তিনি নিজেও তাঁর নাম বললেন, এবং জানালেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গান শুনতে ভালবাসতেন।

আমি এই বৃদ্ধ বাউলের নাম প্রকাশ করছি না। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, প্রকৃতই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, এবং শান্তিনিকেতনে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে গান শুনিয়ে আসতেন। সেই বৃদ্ধ বাউলকে সব সময়েই আমার কেমন ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন মনে হয়েছিল। এক সময়ে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললেন, "বাবা, আমি হলাম 'পতিত' বাউল, প্রকৃত বাউল নই।"

আমি বললাম, "বাউলের আবার 'পতিত' 'প্রকৃত' কী আছে আমি জানি না।"

তিনি জবাব দিলেন, "প্রকৃত বাউলের কখনো সন্তান হয় না। আমার হয়েছে, তার মানে আমি বাউল হলেও একজন সংসারী। অর্থাৎ পতিত, আমার সাধনা ব্যর্থ।" এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবার কান্না থামিয়ে ভাঙা গলায় গান করলেন, "আমি মীন ( মাছ ) ধরবো বলে/ডুব দিলেম ত্রিবেণীর জলে/হায় হায়, মীন গেল পিছলে/আমার অঙ্গ ভিজলো জলে/হায়, পতিত আমি, মরি এখন সেই জ্বালাতে জ্বলে।"···গাইতে গাইতে তিনি শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন।

আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই বিস্ময়কর, দুর্বোধ্য, অথচ বৃদ্ধ বাউলের জন্য মনটা কেমন বিচলিত হয়ে উঠলো। তখন একটি শ্যামলী তরুণী বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরে বললো, "বাবা, ওগো বাবা, কেঁদো না।"

একজন স্বাস্থ্যবান যুবক বাউলও তরুণীর গা ঘেঁষে এগিয়ে এলো, বাউলের পায়ে মাথা ছুঁইয়ে বললো, "বাবা, তবু তুমিই আমাদের গুরু। তোমার জ্বালা আমরা জুড়াবো, তুমি আমাদের আশীর্বাদ কর।"

বৃদ্ধ বাউল যুবকের মাথায় নিজের মুখ নামিয়ে, অনেকটা গানের

বললেন, "হাঁ হাঁ, তোরা ভালো করে পড়গা ইস্কুলে। নইলে দুঃখ পাবি শেষকালে। কিন্তু আমাকে আর বলিস না বাপ, আমি শেষ রক্ষা করতে পারি নি।"

তরুণী বললো, "বাবা, তোমার জ্বালা যন্ত্রণাই আমাদের শক্তি দেবে। তুমিই আমাদের গুরু।"

বৃদ্ধ কিছুটা নিজেকে সামলে নিয়ে, তরুণী আর যুবককে দেখিয়ে বললেন, "এটি আমার মেয়ে, আর এই ছেলেটি ওর সাধক পুরুষ। আমার মেয়ে ওর সাধিকা প্রকৃতি।"

আমি সহজভাবেই বললাম, "তার মানে, আপনার মেয়ে আর জামাই।"

"হ্যাঁ, একদিক থেকে তা বলতে পারো, কিন্তু এখন আর আমার মেয়ে জামাই বলে ওদের পরিচয় নেই। ওরা বাউল সাধক সাধিকা, ওরা পুরুষ প্রকৃতি। ওরা স্বামী স্ত্রী নয়।"

বৃদ্ধ যখন হেসে কেঁদে এসব কথা বলছিলেন, অন্যান্য বাউল পুরুষ রমণীরাও মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনছিল। আমি ধাঁধায় পড়ে গেলাম। স্বামী স্ত্রী না, মেয়ে জামাই না, ওদের একমাত্র পরিচয় পুরুষ ও প্রকৃতি। তার মানে কী? আমি বৃদ্ধের দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলাম। তিনি হেসে চোখ ঘুরিয়ে বললেন, "এ সব তুমি বুঝবে না বাবা। বাউল সাধন তত্ত্ব বড় গোপনীয়, নিজেরা ছাড়া কেউ তা জানতে পারে না।"

বৃদ্ধ বাউল সন্তানের জনক, অতএব তিনি পতিত, কারণ প্রকৃত বাউলের কখনো সন্তান হয় না। এদিকে বাউল সাধক সাধিকার একমাত্র পরিচয়, পুরুষ ও প্রকৃতি, স্বামী স্ত্রী না। আমার কৌতূহল বাড়লো, কিন্তু প্রকাশ করতে পারলাম না। গোপন সাধন তত্ত্বের কথা যে জিজ্ঞেস করা উচিত না, এ অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু বাউলদের আবার কী সাধান তত্ত্ব থাকতে পারে?

বৃদ্ধ আমার দিকে তাকিয়ে, নিচু স্বরে গেয়ে উঠলেন, "সুধা পান

করতে গিয়ে করেছি বিষ পান/এবার তোরা বিষ চিনে, সুধা কর গো পান।"

বৃদ্ধের কন্যার যুবক পুরুষটি বলে উঠলো, "জয় গুরু জয় গুরু।"

বৃদ্ধ হেসে, চোখ ঘুরিয়ে, একতারায় শব্দ তুলে বললেন, "ভাববি, নারী হিজরা, পুরুষ খোজা এই তো লক্ষণ/সাবধানে কর সবে সাধন ভজন।"

এবার সবাই মিলে জয়ধ্বনি দিল, "জয় গুরু, জয় গুরু।"

আমি যে ধাঁধাঁয়, সেই ধাঁধাঁতেই রইলাম। নারী হবে নপুংসক, পুরুষ হবে খোজা, অর্থাৎ যার যৌন শক্তি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এই ভেবে সাধন ভজন করতে হবে। তার মানে কী? আমি যেন তন্ত্রের একটা স্তিমিত প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। অথচ বাউলদের সেরকম কোনো তত্ত্ব থাকতে পারে, আমি ভাবতেই পারি না।

বৃদ্ধ বাউল যুবককে বললেন, "বাবা মাধব, এবার একটু দমের ব্যবস্থা কর।"

"এই যে বাবা, আমি করছি।" অন্য এক বাউল বলে উঠলো।

দেখলাম, সেই বাউলটি গাঁজা তৈরি করছে। একটি ছোট কাঠের পাটার ওপরে, গাঁজার দলা ছুরি দিয়ে কাটছে, আবার জড়ো করে, আবার কাটছে। কিন্তু গান বন্ধ নেই। এক বাউল ও তার প্রকৃতি একসঙ্গে গান ধরেছে। গানের কথা তেমনি দুবোধ্য, "আমার এক কলসে নয়টি ছিদ্র/কেমন করে জল ধরি।"...

বৃদ্ধ বাউলের তরুণী কন্যাকে দেখে, বর্দ্ধমানের প্রান্তিক গ্রামের ভৈরবীচক্রের সেই কৃষ্ণাঙ্গী অষ্টাদশীর চেহারা ভেসে উঠছিল। কিন্তু দুজনের চেহারায় বিস্তরতফাত্‌! এই তরুণীর বয়স একুশ বাইশ হবে। গায়ের রঙ তেমন কালো না। চোখ দুটি যেন কাজল টানা কালো ও দীর্ঘ, অথচ কাজল সে মাখে নি। মুখের গড়ন কিঞ্চিৎ লম্বা, কিন্তু নাক ঠোঁট চিবুক, সব মিলিয়ে তাকে সুন্দরী বলতেই হবে। শীতকে তার তেমন গ্রাহ্য নেই। সামান্য একটি জামার ওপরে লাল পাড় শাড়ি,

কপালে সিঁদুরের একটি ফোঁটা। উজ্জ্বল নিটুট স্বাস্থ্য। মুখে একটু হাসি লেগেই আছে। শান্ত আর স্নিগ্ধ তার মুখ, লাজুক নম্রতা চোখের দৃষ্টিতে। তার পাশে মাধবের শক্ত চওড়া শরীরে গেরুয়া রঙের লম্বা আলখাল্লা, তার নিচে একই রঙের ধুতি দেখা যাচ্ছে। তার মাথায় পাগড়ি, কালো গোঁফ দাড়ি, চোখ দুটি উজ্জ্বল, উন্নত নাসা। দুজনকেই আমার চোখে সুন্দর লাগছিল। তারা বৃদ্ধ বাউলের দু পাশে বসে, গান শুনতে শুনতে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টিবিনিময় করছিল, আর যেন একটা অর্থ-বোধক হাসি ফুটে উঠছিল। যেন তাদের মধ্যে গোপনে কোনো ইশারা চলছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, দুজনে নতুন প্রেমিক প্রেমিকা।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ বাউলের হাতে জ্বলন্ত গাঁজার কলকে এগিয়ে দেওয়া হলো। তিনি "জয়গুরু" বলে, দু হাতে কলকে চেপে ধরে কয়েকটি ছোট টান দিলেন। তারপরে হঠাৎ এমন দীর্ঘ টান দিলেন কলকেয় দপ করে আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু ধোঁয়া ছাড়লেন না, ভিতরে আটকে রাখলেন। কলকেটা বাড়িয়ে দিলেন মাধবের হাতে। দেখলাম, আড্ডায় তখন তিনটি কলকে বাউল পুরুষদের হাতে হাতে ঘুরছে।

আমার হঠাৎ মিষ্টির কথা মনে পড়ে গেল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু বৃদ্ধ বাউল আমার হাত টেনে ধরলেন। তার তরুণী কন্যা জিজ্ঞেস করলো, "কোথা যাচ্ছেন ? বসবেন না ?"

মনে রাখতে হবে, কথাগুলো সবই বীরভূম জেলার আঞ্চলিক উচ্চারণে বলা হচ্ছিল। আমি বললাম, "এখনই আসছি।"

বৃদ্ধ বাউল কন্যার দিকে তাকিয়ে আমার হাত ছেড়ে দিলেন। আমি বাউলদের সমাবেশের বাইরে, সাধারণ মেলায় গিয়ে, মিষ্টির দোকান থেকে, কিছু বেশি পরিমাণে মিষ্টি কিনে নিয়ে এলাম। আমার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি দেখে বৃদ্ধ শিশুর মতো হা হা করে হেসে কন্যার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অগো পূর্ণিমা, এ যে দেখছি প্রেমের মানুষ ! গাজাখোরদের জন্য মিষ্টি নিয়ে এসেছে ?"

বাউল পুরুষ রমণীরা সবাই হেসে উঠলো। সকলেই খুশি। পূর্ণিমা বললো, "প্রেমের মানুষটি সব জানে দেখছি। তবে একটু দম দেওয়া হোক ?"

আমি মিষ্টির হাঁড়িটি বৃদ্ধের সামনে রেখে বসলাম। মাধব আমার দিকে কলকে বাড়িয়ে দিল। আমিও কলকে নিয়ে, আগের মতোই টান দিলাম। দেখে সবাই হাসলো। বৃদ্ধ বাউল একটি মিষ্টি আমার মুখে তুলে দিলেন। পূর্ণিমা একটি ঝকঝকে কাঁসার ঘটিতে করে আমাকে জল দিল। বৃদ্ধ পূর্ণিমার হাতে মিষ্টির হাঁড়ি এগিয়ে দিলেন। পূর্ণিমা আগে তার বাবাকে মিষ্টি দিল। তারপর সবাইকেই পরিবেশন করলো। আড্ডাটি বেশ জমে উঠলো। গাঁজার এবং মিষ্টি পাট মিটে যাবার পরে, পূর্ণিমা মাধবের দিকে তাকালো। মাধব মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু ইশারা করলো। পূর্ণিমা তার হাতের কাছে রাখা খুঞ্জনি জোড়া তুলে নিল, এবং কোকিলের মতো মিষ্টি সুরে গেয়ে উঠলো, "সে কথা কি কইবার কথা,জানতে হয় ভাবাবেশে। অমাবস্যায় পূর্ণশশী, পূর্ণিমাতে অমাবস্যে।"

মুহূর্তে আমার মস্তিষ্কে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক দিল। এ গান কেন বাউলের মুখে ? আমার অভিজ্ঞতায়, এ তো তন্ত্রের বিষয়। পূর্ণিমার সঙ্গে মাধবও একতারা বাজিয়ে গান ধরলো। সমস্ত গানটিই অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের মতো দুর্বোধ্য। কিন্তু গানের কথার মধ্যে, 'মাসে একবার সেই ক্ষণ আসে' বা 'পুরুষ প্রকৃতি রতি। 'প্রেম রসেতে ভাসি' ইত্যাদি কথাগুলো ক্রমেই যেন বিশেষ একটি দিক নির্দেশ করছে। অন্যান্য গানের মধ্যেই শুনছি, 'পুরুষ প্রকৃতি কাম কলার কেলি করে' কিন্তু, 'কামকে দেখবে ভয়ংকর কুমীর রূপে, সে যেন তোমাকে গ্রাস না করতে পারে।'...এমন কি কবি চণ্ডীদাসের একটি গানের বিশেষ কয়েকটি পংক্তিকেও এক জায়গায় গানে ব্যবহার করা হয়েছে, "পুরুষ-প্রকৃতি / দোঁহে এক রীতি / সে-রতি সাধিতে হয়।" ...অথবা, "রেচক, পূরক, স্তম্ভন দিয়ে নদী কর বন্ধন / প্রেম ভক্তি খুঁটি

তার কর স্থাপন।"···কথাগুলো গানের নানা কথার মধ্যে এমনভাবে আত্মগোপন করে আছে, কান পেতে না শুনলে, হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। যেমন একটি গানের মধ্যে এক যায়গায় বলা হচ্ছে, "রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম হয় / প্রেম যতো বাড়ে নাম স্নেহ-মান-প্রণয়।"

বাউল গানে এসব কথার অর্থ কী? আগে যে সব গান শুনেছি তার মধ্যে কান পেতে এসব কথা স্পষ্টভাবে শুনি নি। যেমন শুনেছি, "আছে প্রেম প্রয়োজন / রসিক ময়রা হলে সে পাবে প্রেমধন।" অথবা, "জগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ যারে বলি / প্রেম-পীরিতি রসে সে-মানুষ করে কেলি।" কিংবা, "মনরে, চল রূপনগরে।" তারপরেই সেই গানের শেষে শুনছি, "সুষুম্না ধরিয়ে, মৃণাল বাহিয়ে ওঠো সেই পদ্ম পরে।" এই শেষের লাইনটি মনকে চমকিয়ে দেয়। যেমন 'রতি' শব্দ। রতি রমণী হতে পারে, আবার 'রতিক্রিয়া' হতে পারে। যাকে তন্ত্রে সরাসরি 'মৈথুনক্রিয়া' বলা হয়েছে। সুষুম্না নাড়ি একান্তই দেহতত্ত্বর বিষয়, তন্ত্রের সঙ্গে যার যোগ।

অথচ সাধারণ ভাবে বাউল গানের ভাষা শুনতে একেবারে অন্যরকম লাগে। "সোনার মানুষ ভাসছে রসে/যে জানে সে রসপন্থী/ দেখতে পায় সে অনায়াসে।" অথবা "ওরে সহজ মানুষ সবাই বলে/ আছে কোন্ মানুষের বসত কোন্ দলে।"···এ সব কথা গানের সুরে শুনতে ভালো লাগে, অর্থ বোঝা যায় না!

রাত্রি একটা পর্যন্ত অনেকগুলো গান শুনলাম। তার মধ্যে কোনো কোনো কথা আমাকে কৌতূহলিত করেছে, যা আমি বাউলদের সঙ্গে মেলাতে পারিনি। রেচক পূরক কুম্ভকের কথা কেন তাদের গানে? গানে বলছে, এ সবের দ্বারা তারা 'রসসিদ্ধ' হয়, কিন্তু 'জীবাকার করে না, প্রেমাকার করে।' কিন্তু শিব শক্তির বদলে পুরুষ-প্রকৃতি ছাড়া সাধন হয় না। অবিশ্যি বৃদ্ধ বাউল আমাকে আগেই বলেছিলেন, বাউল সাধনতত্ত্ব অত্যন্ত গোপনীয়, নিজেরা ছাড়া কেউ

জানতে পারে না। তা হলে কি বাউল ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের কোনো যোগ আছে?

রাত্রি একটার পরে গানের আসরে কিছু ক্লান্তি নেমে এলো। আবার গাঁজার আসর চললো। বৃদ্ধ বাউল আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "বাবাজী দেখছি গানের খুব ভক্ত।"

বাউল গানের আমি বরাবরই ভক্ত, কিন্তু এই আসরের গানগুলো শুনে, আমার মনে বাউলদের সম্পর্কে নতুন প্রশ্ন জাগছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনাদের দেবতা কে? কার পূজা করেন?"

"আমাদের তো বাবা কোনো দেবদেবী নেই। আমরা গুরুর পূজা করি। গুরুই আমাদের সব, সাধনার ধন। তবে আসল গুরুকে চোখে দেখা যায় না। কেউ শিক্ষা দেন, দীক্ষাও দেন, আসল গুরুর নাম হলো আত্মা।"

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনারা আত্মার পূজারী? কোথায় আছেন সেই আত্মা?"

"কেন এই ভাণ্ডে।" বলে বৃদ্ধ বাউল তাঁর মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখালেন, "এই ভাণ্ডের মধ্যেই সেই আত্মার বাস। তাঁর অনেক নাম। 'মনের মানুষ' 'সহজ মানুষ' বা 'অটল মানুষ'। আবার 'ভাবের মানুষ' ও বলতে পারো। গুরু অতি গোপনে থাকেন। আমরা সেই গুরুর সাধন ভজন করি, আর কারোকে না।"

বিষয়টি রহস্যময় মনে হলো। 'গুরু' অতি গোপনে থাকেন, যাঁর এক নাম 'আত্মা' এবং 'মনের মানুষ' বা আরও অনেক। কিন্তু তার সঙ্গে প্রকৃতি পুরুষ রতি, রেচক কুম্ভক স্তম্ভন ইরা সষুম্না পিঙ্গলা, ইত্যাদির সম্পর্ক কী? বৃদ্ধ বাউল আগেই বলেছেন, তাঁদের সাধনতত্ত্ব অতি গোপন, অতএব কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভরসা পাচ্ছি না। তিনি আমার দিকে তাকালেন। রহস্যের হাসি তাঁর ধূসর গোঁফ দাড়ির ভাজে ভাজে, গঞ্জিকা সেবনে আরক্ত চোখে। মাথা

ঝাঁকিয়ে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বললেন, "বাবাজী বড় ধন্দে পড়ে গেলে ? ও সব নিয়ে ভেবো না। এ সব হলো গোপন সাধন তত্ত্ব, সকলে জানতে পারে না। তবে একটা কথা বলতে পারি, এ ভাণ্ডে আর ব্রহ্মাণ্ডে কিছু তফাত নেই।" তিনি নিজের বুক আর আকাশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন।

এ কথাও আমার কাছে নতুন না। কামাখ্যায় প্রাণতোষবাবার কাছেই শুনেছিলাম, যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। অমাবস্যায় চাঁদের উদয়ের কথাও সাবিত্রী মায়ের কাছে শুনেছিলাম। সে তো তন্ত্রের বিষয়। এঁদের কথার সঙ্গে অনেকটাই মিলে যাচ্ছে। অথচ এঁরা গোপনে গুরুর সাধন ভজন করেন। এঁরা আত্মার পূজারী। ওদিকে দেখছি, মাধব আর পূর্ণিমা পাশাপাশি বসে আমাদের কথা শুনছে। দুজনেই আমার দিকে তাকিয়ে দেখছে, আর নিজেদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। সে-হাসিও রহস্যময়। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ বাউলের হাতে আবার একজন গাঁজার কলকে তুলে দিল। তিনি আগের মতোই দম দিলেন, তারপরে আমার দিকে কলকেটি বাড়িয়ে দিলেন। আমিও এবার একটু জোরেই টান দিলাম, ফলে বেজায় কাসি শুরু হয়ে গেল। বৃদ্ধ বাউল আমার মাথায় হাত দিয়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিলেন, বললেন, "জয়গুরু জয়গুরু !"

মাধব আমার হাত থেকে কলকে নিল। হেসে বললো, "আমাদের বাবু বাবাজীর মন এখন প্রেমে আঁকুপাঁকু করছে। প্রেমের কথা শুনতে চান।"

আমি বললাম, "প্রেমের কথা তো শুনতে চাইনি, আমি আপনাদের তত্ত্বের কথা বোঝবার চেষ্টা করছি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বাবাজী, ঐ হলো প্রেমের কথা। আমাদের আসল তত্ত্ব প্রেমতত্ত্ব।" বৃদ্ধ বললেন।

পূর্ণিমা গেয়ে উঠলো, "যে জন প্রেমের ভাব জানে না / তার সঙ্গে নেই লেনা দেনা।"

"জয় গুরু জয় গুরু।" বৃদ্ধ বাউল বলে উঠলেন. "আমাদের এই বাবাজীটি প্রেমের মানুষ, তাই নয় কি ?"

পূর্ণিমা বললো, "হ্যাঁ, বাবু বাবাজী প্রেমের মানুষ।"

আমি বৃদ্ধ বাউলকে বললাম, "কিন্তু আমি আপনাদের গুরুতত্ত্বটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটু বলবেন কি ?"

বৃদ্ধ বাউল হেসে হেসে মাথা ঝাঁকালেন, তারপরে আমার কানের কাছে ঝুঁকে বললেন, "আমাদের আসল গুরু তিন রকম। পুরুষ, প্রকৃতি, আর পুরুষ প্রকৃতির মিলন। এই নিয়েই আমাদের সাধন। কিছু কি বুঝলে বাবাজী ?"

আমি একটু দ্বিধা করে বললাম, "ঠিক বুঝেছি, বলতে পারি না, তবে শক্তি সাধনা তন্ত্রের কথা আমার মনে পড়ছে।"

বৃদ্ধ বাউল হা হা করে হেসে উঠে আমার পিঠে চাপড় মেরে বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, কতোকটা বুঝেছো বটে। তবে বাউল সাধনা আর হিন্দুদের তন্ত্র সাধনা, দুয়েতে তফাত আছে। যোগ সাধনা আমাদেরও আছে। রমন কাকে বলে জানো তো ?"

আমি মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম, "শব্দের অর্থটা জানি।"

"আমাদের আত্মায় আত্মায় রমন হলে, রমন তারে কয়।" বৃদ্ধ বাউল বললেন, "আমাদের উপাসনা নেই, দেহের সাধনই সব, কিন্তু সেই দেহ আত্মা রূপে আছেন। আর কিছু বলার নেই।"

সবই বুঝলাম, অথচ বুঝলাম না কিছুই। ইতিমধ্যে আবার গান শুরু হয়ে গেল, এবং এক সময়ে রাত্রি শেষ হয়ে এলো। দেখলাম, সবাই যে-যার জিনিষপত্র গুছিয়ে আড্ডা ভেঙ্গে অজয় নদের ধারে গেল। সবাই নেমে পড়লো শীতের তুহিন ঠাণ্ডা জলে। পূর্ণিমা জলে নেমে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "চান করবেন না ?"

বললাম, "করবো।"

আমি কাঁধের ঝোলা নামিয়ে, জামা কাপড় খুলে, আণ্ডারওয়্যার পরে জলে নেমে পড়লাম। সকলের সঙ্গে স্নান করলাম। মেয়ে

পুরুষ, কে নগ্ন আর কে নগ্ন নয়, সে বিচার এখানে অচল। প্রচণ্ড ভিড়, আর জলের স্রোতের টান তীব্র। কে কার গায়ে মেশামিশি করে আছে, কেউ দেখছে না। আমাকে মাধব হাত ধরে রেখেছে। আর এক পাশে উদ্ভিন্ন যৌবনা পূর্ণিমা।

স্নানের শেষে জামা কাপড় পরে, সকলেই আগে গেল মন্দিরে। যতোদূর মনে পড়ছে, মন্দিরটি শ্রীরামের। অথচ কবি জয়দেব যে কোন্‌খানটিতে বাস করতেন, তা কেউ বলতে পারলো না। বৃদ্ধ বাউল বললেন, "এ জায়গার নামই জয়দেব। তোমরা বলো কেন্দুলি, আমরা বলি জয়দেব।"

"তিনি কি আপনাদের আদিগুরু ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বৃদ্ধ বাউল বললেন, "তোমাকে তো আমাদের গুরুতত্ত্বের কথা বলেছি। তবে হ্যাঁ. তত্ত্ব জানবার জন্য মানুষ গুরু দরকার হয়। সেই হিসাবে জয়দেব আমাদের গুরু। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, আমাদের অনেক গুরু। সেদিক দিয়ে দেখলে আমাদের গুরুর শেষ নেই।"

তারপরে সকলেই দেখলাম মুড়ি খই ইত্যাদি খেলো। আমাকেও দিল। মাধব আর পূর্ণিমা মেলা থেকে মাটির হাঁড়ি, কাস্তে, দা ইত্যাদি কয়েকটি জিনিস কিনলো। তারপরে বিদায় নেবার সময় আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "বাবু, আপনি কোথায় যাবেন ?"

বললাম, "আপনাদের সঙ্গেও যেতে পারি।"

পূর্ণিমা বললে. "আমরা তো দূরের গ্রামে থাকি।"

"আমি দূরের গ্রামেও যেতে পারি।"

মাধব আর পূর্ণিমা বৃদ্ধ বাউলের দিকে তাকালো। বৃদ্ধ বাউল হেসে বললেন. "বুঝেছি, মনে তোমার মাতন লেগেছে। বেশ, চলো। তুমি আমি দুজনেই মাধবের আখড়ায় গিয়ে থাকবো। দুদিন থেকে যে যার বাড়ি চলে যাবো।"

কেন্দুলি থেকে বাসে চেপে, প্রায় তিরিশ মাইল গিয়ে, আরও পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে আমরা পৌঁছুলাম এক গণ্ডগ্রামে। গ্রামের এক প্রান্তে মাধবের বাড়ি বা আখড়া। দেখলাম, লেপা মোছা পরিচ্ছন্ন উঠোনে রয়েছে ধানের একটি মরাই। দুটি মাটির ঘর, মাথায় খড়ের চাল। পাশে আর একটি ছোট ঘর সেখানে রান্না হয়। বাড়ির পিছনে একটি বাঁশঝাড়। বাঁশঝাড় থেকে একটু দূরে একটি পুকুর। পুকুরের চারপাশে তালগাছ। পুকুরের অন্যদিকে আসল গ্রাম, বাড়িঘর বেশি। মাধবের বাড়িটি একটু ফাঁকায়। একে আখড়া না বলে, গৃহস্থের বাড়ি বললেই যেন মানায়।

পৌঁছুতে আমাদের বিকাল হয়ে গিয়েছিল। পূর্ণিমা আমাকে অবাক করে দিয়ে, রান্না ঘর থেকে চা তৈরি করে এনে দিল। আমাকে একলা না, মাধব এবং তাঁর বাবাকেও। মাধব তামাক সেজে হুঁকো এগিয়ে দিল। সন্ধ্যাবেলা গাঁজা সাজা হলো। পূর্ণিমা রান্নায় ব্যস্ত। মাধব মাঝে মাঝে পূর্ণিমার সাহায্যে যাচ্ছে। বৃদ্ধ বাউল আমাকে গান শোনাচ্ছেন। 'গাঁজার দম' গানের ব্যাখ্যা করে বললেন, "গানটা শুনে তুমি আসল কথাগুলো বুঝতে পারছো না। দম কাকে বলে? নিশ্বাস প্রশ্বাসকে। আমরা বলি দমের ঘর। আমাদের সাধনার জন্য এই দমের ঘরকে তৈরি করতে হয়। প্রাণায়ামের কথা শুনেছো?"

"শুনেছি।"

"এ হলো সেই প্রাণায়াম, দমের ঘর। শরীরের শ্বাসনালি পরিষ্কার না থাকলে সাধন হয় না। সাধনের মূল হলো এই শরীর। তোমাকে আমি ত্রিবেণীর কথা বলেছি। সেই ত্রিবেণী এই শরীরেই আছে, যার নাম ইরা সুষুম্না পিঙ্গলা। সেখানে যখন জোয়ার আসে, তখন সাধক সেই ত্রিবেণীতে ডুব দেয়, মনের মানুষকে ধরে। কেউ বলে মীন ধরে। জোয়ার কোথায় আসে? না, প্রকৃতির মধ্যে, মাসে একবার। তিন দিন। সেই সময়ে জোয়ারে ডুব দিতে হয়। পুরুষ আর প্রকৃতি দুজনের সাধনায় সেই মনের মানুষকে পাওয়া যায়।"

আমি শুনছি, আর বারে বারে তন্ত্র সাধনার কথাই আমার মনে পড়ে যাচ্ছে। পুরুষ-প্রকৃতি মিলন। তার সঙ্গে যোগ সাধনা। প্রকৃতির জোয়ার, মাসান্তে একবার। তার মানে সাধিকার ঋতুর সময়। বৃদ্ধ আবার গান করলেন, এবং সেই গানের কথা ব্যাখ্যা করে শোনালেন, "প্রকৃতির সত্তা রজে, পুরুষের বীর্যে, জল আর দুধের মতো এদের মিলন ঘটে। রজঃ হলো কাম স্বরূপিনী কিন্তু বীজ অচঞ্চল প্রেমস্বরূপ। এ দুধের আর এক নাম ক্ষীর, রজের আর এক নাম নীর। দুধকে নীর থেকে আলাদা করতে হবে, অর্থাৎ বীজকে। এই বীজই হলো 'সহজ মানুষ' বা 'মনের মানুষ'। প্রকৃতির রজে এই মনের মানুষের আবির্ভাব হয়। তখন সাধক সেই 'মনের মানুষ'কে ধরতে সাধন করে। কাম থেকেই প্রেম, কিন্তু প্রেম অটল। প্রকৃতি পুরুষের মিলনে মহাসুখেই সেই 'সহজ মানুষ' পাওয়া যায়। প্রকৃতির ঋতুর তিন দিন সহজ মানুষ ধরার সময়। ঐ সময়ের নাম 'মহাযোগ' বা 'সুবর্ণ সুযোগ'।"

এই সময়ে একটি দৃশ্য আমার চোখে পড়লো। আমি দেখলাম, রান্না ঘরের আলো বাইরে এসে পড়েছে। সেই আলোয় রমণী পুরুষ দুটি মূর্তির ছায়া পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে। অর্থাৎ মাধব আর পূর্ণিমা দুজনকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করছে। আমি অবাক হলাম না, বরং এই প্রেমের দৃশ্য দেখে আমি উত্তেজনাহীন একটা আনন্দ বোধ করলাম। আমি প্রথম থেকেই দেখে আসছি, মাধব আর পূর্ণিমা যেন দুটি সুখী পায়রার মতো সর্বদাই গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থাকছিল। যেমন নতুন প্রেমিক প্রেমিকা থাকে।

বৃদ্ধ বাউল আমাকে গান শুনিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছিলেন। ব্যাখ্যা গুলো সবই, আমার আগে জানা তন্ত্রের মতো। যোগ, প্রাণায়াম, মৈথুনাত্মক মিলন। তবে গানের ভাষা শুনে কিছুই বোঝার উপায় নেই। কুলকুণ্ডলিনী, জননেন্দ্রিয়র মূল পর্যন্ত স্থানকে মূলাধার বলে, সবই দেখছি গানের মধ্যে আছে। কিন্তু বাউলরা সব কিছুকেই

নিজেদের বিশেষ সাংকেতিক ভাষায় প্রকাশ করে। যেমন 'ত্রিবেনীর ঘাট' আসলে প্রকৃতির জনেন্দ্রিয়, সেই ঘাটে বাউল সাধক 'মীন' শিকার করে। প্রকৃতির রজঃ প্রবাহকে তারা বলে 'সিন্ধু' 'রূপসাগর' 'শ্রীরূপ নদী' ইত্যাদি। গান শুনে আমাদের বোঝবার উপায় নেই।

শরীরের বর্ণনায় তারা আটটি চন্দ্রের কথা বলে। মুখ দুই স্তন, দুই হাত, একটি ( পুরুষের ) বুক, নাভি, উপস্থ-অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়। কিন্তু এই আট চন্দ্র হলো বাহ্যিক। আরও চারটি চন্দ্র আছে। সে-কথাও বৃদ্ধ বাউল আমাকে গানের ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন। প্রকৃতির রজঃ প্রবাহের প্রথম দিনটিতে তাঁরা 'অমাবস্যা'ও বলে, আর সেই অমাবস্যায় সাধক চাঁদের উদয় ঘটায়। তন্ত্রের সঙ্গে এখানে তাদের তফাত্ এই, প্রথম দিনই তারা রজঃবিন্দু পান করে।

বৃদ্ধ বাউল আমাকে জিজ্ঞেস করবেন, "তুমি পঞ্চগব্য কাকে বলে জানো ?"

বললাম, "জানি। গো-মুত্র, গো-বিষ্ঠা, দুধ, ঘি, দই। সবই গরুর দেহের বস্তু।"

"পঞ্চগব্য খেলে শরীর সুস্থ থাকে, রোগ আরোগ্য হয়। শরীর শোধন হয়।"

"জানি।"

বৃদ্ধ বাউল আমাকে একটি গান শোনালেন, "চারচন্দ্রের নিরূপণ, জানগা মন তার বিবরণ/জানলে পরে জীবদেহেতে ঘুচে যেতো কুমতি।" পুরো গানটিই দুর্বোধ্য। বললেন, "প্রকৃতি আর পুরুষের দেহের বিশেষ বিশেষ বস্তু বিশেষ বস্তু দিয়ে চারচন্দ্র হয়, আর এ চারচন্দ্র বাউলরা খায় ও পান করে। নীর ক্ষীর মাটি রস, এই চারটি মিলে চারচন্দ্র। বাউল এ বস্তু খেলে তার শরীর সাধনার জন্য পরিপক্ক হয়। পুরুষ প্রকৃতির নীর মুখ দিয়ে গ্রহণ করে। প্রকৃতি পুরুষের বীজ মুখ দিয়ে মোক্ষণ করে। মাটি আর রস কি, তুমি বুঝে নাও, সবই শরীরের ভিতরের বস্তু। ঘৃণা থাকলে, এ সাধন হয় না।

তবে একদিনেই, এক সঙ্গে এসব হয় না। প্রকৃতির প্রথম দিনের রজঃ পুরুষ গ্রহণ করে, বীর্য অন্য দিন। সেই মোক্ষিত বীর্য দিয়ে তারা কপালে আগে ত্রিপুণ্ড্র আঁকে। তারপরে পান করে। মাটি আর রস, পনর দিন বা মাসান্তেও গ্রহণ করা চলে।"

এই বিষয়টির সঙ্গে শক্তি তন্ত্রের কোনো মিল পেলাম না। বৃদ্ধ বাউলের মুখেই প্রথম শুনলাম। গন্ধ, স্বাদ নিয়ে কোনো দ্বিধা থাকলে চলবে না। কারণ চারচন্দ্রের দ্বারা বাউলের শরীর সাধনার উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ এখানেও সেই, "লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকিতে নয়"।

পরের দিন সকালে আমার ঘুম একটু দেরিতে ভাঙলো। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ হওয়ার পরে। পূর্ণিমা আমাকে চা আর মুড়ি খেতে দিয়ে বললো, "বাবাজী, আমি কদিনের জন্য বিদায় নিলাম।" বলে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল। স্নান শেষে, খোলা চুলে তাকে একটি কুমারী মেয়ের মতো দেখাচ্ছিল। আমি তার কথার অর্থ বুঝতে পারলাম না। বৃদ্ধ বাউল আমাকে নিচু স্বরে বললেন, "মহাযোগ উপস্থিত হয়েছে, অমাবস্যার উদয় হয়েছে। মাধব আর পূর্ণিমা এখন চারদিন সাধনায় ব্যস্ত থাকবে।"

আমি গভীর প্রত্যাশায় অথচ উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আমাকে কি চলে যেতে হবে ?"

"না, মাধব আর পূর্ণিমা তোমাকে আমার সঙ্গে থাকতে বলেছে।" বৃদ্ধ বাউল বললেন, "তবে আমাদের দুজনকেই হাত পুড়িয়ে রান্না করে খেতে হবে।"

আমি মহা উৎসাহে বললাম, "কোনো আপত্তি নেই। আমি কি মাধব আর পূর্ণিমার সাধনা দেখতে পাবো ?"

বৃদ্ধ বাউল গম্ভীর মুখে বললেন, "তা কী করে দেখতে পাবে ? এ কি তুমি ভৈরবী চক্র ভেবেছো ? বাউল সাধনা কেউ দেখতে পায় না।

ওরা দুজনে এখন চারদিন ঘরের বাইরে বিশেষ আসবে না। তবে তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারবে।"

আমি তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করলাম। গতরাত্রে মাধব আর পূর্ণিমার ছায়া আলিঙ্গন ও চুম্বন দেখেছিলাম। সেই সময়েই কি পূর্ণিমার 'রজঃ দর্শন' হয়েছিল? মাধবকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। একটু পরেই দেখলাম, সে স্নান করে, ভেজা কাপড়ে, মাথায় একটি বেতের চুপড়িতে কিছু নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তারপর সে আর পূর্ণিমা বাইরে এসে বৃদ্ধ বাউলকে প্রণাম করলো। বৃদ্ধ বাউলও মাটিতে মাথা ঠেকালেন। মাধব পূর্ণিমা আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। দুজনেই হাত তুলে নমস্কার করলো। মাধব বললো, "আপনার যে কদিন খুশি থাকুন। থাকা না থাকা আপনার ইচ্ছা। আমাদের বিদায় দিন।" আমি বিদায় দিতে জানি না। কেবল দু হাত তুলে নমস্কার করলাম। পূর্ণিমা বৃদ্ধ বাউলকে বললো, "তোমাদের কয়েকদিনের খাবার চাল ডাল সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।"

বৃদ্ধ সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বারে বারেই "জয়গুরু জয় গুরু" বলে উল্লাস প্রকাশ করছিলেন। মাধব আর পূর্ণিমা তাদের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলো। বৃদ্ধ বাউল বললেন, "চলো, আমরা কাঠ কেটে উনোন জ্বালাই, তারপরে রান্না চাপাবো।" কিন্তু গান তাঁর সমানেই চললো। গানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যাও চললো, "এখন দুদিন বিন্দু আর রস পান, সেই সঙ্গে মিলন ক্রিয়া কিন্তু তার মানে এই নয়, সব সময়েই পান আর ক্রিয়া চলবে। তার বিশেষ সময় আছে। দমের ঘরের অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসের বিশেষ সময়ের ওপরেই ক্রিয়া নির্ভর করে। ক্রিয়াটি রাত্রেই, কিছু খাবার পরে ঘটে।" বোঝা গেল রজঃ আর শুক্রকে কখনো কখনো 'বিন্দু' এবং 'রস' বলা হয়েছে। গানের ব্যাখ্যাতেই জানা গেল, ক্রিয়ার আগে 'আলাপন' এবং সেই 'আট চন্দ্রের' নানা শৃঙ্গার চলবে। এই আট চন্দ্র মুখ হাত স্তন বুক জননেন্দ্রিয় ইত্যাদি। কুম্ভকের কথা প্রত্যেক গানেই আছে।

বিভিন্ন নামে। তৃতীয় দিনের রাত্রি শেষে, আমার হাল্‌কা ঘুম ভেঙে গেল। আমি মাধবের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। বাইরে যাবার ইচ্ছা থাকলেও, আমি গেলাম না। মাধব আর পূর্ণিমার গলার অস্পষ্ট কথা আমার কানে এলো। কথা কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পরে আবার দরজা বন্ধ হবার শব্দও পেলাম।

তৃতীয় দিনে বৃদ্ধ বাউলের গানের ব্যাখ্যায় জানলাম, "বিন্দূ আর রস পান শেষ। এখন কেবল ক্রিয়া। কিন্তু ক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ সময় আছে।" এই সব গানে 'যোগ' 'কুম্ভক' 'আপানবায়ু' মূলবন্ধ' এ সব কথাই বেশি, আর বারে বারেই সাবধান বাণী, 'সে' আসছে, সাবধান! বিন্দু অবিচলিত রাখো। 'কাম' শোধ, এবার 'প্রেম' এর উদয় হতে চলেছে। সেই 'অধর মানুষ'-এর আসার সময় হয়েছে।

চতুর্থ দিনে গানে কেবল. 'উজানে চলো, 'উল্‌টা কলে চলো' 'আর মানুষকে অনুভব কর।' কী করে অনুভব করা সম্ভব? নিরন্তর মুহাসুখের মধ্যে। একটি গানের ব্যাখ্যা : সাধক পায়ের গোড়ালি দিয়ে, যোনিস্থান সবলে চেপে ধরবে, রমণ চলতে থাকবে, আর গুহ্যদ্বার বারে বারে আকুঞ্চন করে, বীর্যকে উর্ধ্বগামী করবে, এর নাম মূলবন্ধ। কিন্তু বিন্দূ অর্থাৎ শুক্র কোনোরকমেই বিচলিত হবে না, টলবে না, স্খলিত হবে না। তাকে কেবল উর্ধ্বগামী করে রাখতে হবে। এই সময়ে বিপরীত বিহার চলতে পারে, আর চোখে চোখে তাকিয়ে শৃঙ্গার। যে যতো বড় সাধক, সে মৈথুন-মিলনের নিরন্তর নিবিড় আনন্দময় অবস্থায় সব থেকে বেশি সময় থাকতে পারে। চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি হতে পারে। কারণ সে তো 'ঈশ্বর' চায় না। চায় নিরন্তু প্রেমলীলা-বিলাসময় 'মানুষ'। কিন্তু বীজ থাকবে অটল।

তন্ত্রসাধনায় এমন অসম্ভব কিছু নেই। প্রকৃত পক্ষে ছিয়ানব্বই ঘণ্টারও ওপর সাধনা চলছিল। শেষের দিন পূর্ণ চব্বিশ ঘণ্টা তো অবিচ্ছিন্ন মিথুনানন্দ। পঞ্চম দিনে আমার ঘুম ভাঙলো গানের সুরে। দরজা খুলে দেখলাম, মাধব আর পূর্ণিমা স্নান শেষে উনোন

ধরিয়েছে। গান করছে মাধব। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে পূর্ণিমা। তাদের দুজনকে যেন আমি এক ভিন্ন জগতের আলোকিত পুরুষ প্রকৃতি রূপে দেখছিলাম। যেন একটা জ্যোতি ফুটে বেরোচ্ছিল তাদের শরীর থেকে। আর তারা দুজনেই কাজের মধ্যেও হাসি গানে মত্ত। তারা দুজনে যেন এ জগতে নেই। দুটি পুরুষ প্রকৃতি এক নিবিড় সুখে মগ্ন। বৃদ্ধ বাউলও গান করছেন, হাসছেন আর কাঁদছেন।

পঞ্চম দিন, দুপুরের খাবার পরে আমি বিদায় নিলাম। বৃদ্ধ বাউল ও মাধব আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মাধব বললো, "তুমি এখন আমাদের বন্ধু, যখন খুশি আসবে।"

পূর্ণিমা বললো, "তুমি প্রেমের মানুষ, তোমার সঙ্গে আমাদের প্রেমের সম্পর্ক।"

আমি তারপরেও কয়েকবার বীরভূমের সেই গণ্ডগ্রামে, মাধব আর পূর্ণিমার কাছে গিয়েছি। অত্যন্ত শোকের বিষয়, কিছুকাল আগে পূর্ণিমা মারা গিয়েছে।

বাউলদের দেহতত্ত্ব যে তন্ত্র সাধনারই এক রূপ, আমার জানা ছিল না। কয়েকটি তফাত চোখে পড়লো। তার মধ্যে বিশেষ করে বীর্যপাত। হিন্দুতন্ত্র সাধনায় বীর্যপাত আছে, বাউলদের মিলনে তা নেই। পরে বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের কথা বইয়ে পড়তে গিয়ে, মনে হয়েছে, তাদের সঙ্গে বাউল সাধনার মিল আছে। বাউলরা তন্ত্রের পঞ্চ'ম'কারের মাত্র একটি 'ম'—অর্থাৎ প্রকৃতি গ্রহণ করে। সেটা অনিবার্য। কিন্তু মদ মাংস মাছ ইত্যাদি গ্রহণ করে না। বাউলদের বৈশিষ্ট্য "চারচন্দ্র" এবং বীর্যপাতহীন নিরন্তর মিথুনানন্দ। ব্যাখ্যা, এই ব্রহ্মাণ্ডে নিরন্তর যা ঘটছে, এই দেহে, তারই ক্রিয়া চলছে। বাউল ঈশ্বর বিশ্বাসী না। যেমন একটি গানে বলা হচ্ছে, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি তর্পণের দ্বারা যদি তোমার পূর্বপুরুষকে জল দান করতে পারো, তবে ঐ যে কৃষক জলের অভাবে চাষ করতে পারছে না, তার মাঠে কেন তর্পণের দ্বারা জল

সিঞ্চন করছো না?" তাদের গানের মধ্যেই যেমন সাধনার সব গোপন কথা নানা 'প্রতীক' শব্দে দুর্বোধ্য, তেমনি মানুষের প্রতি প্রেম ভালবাসার কথাও ফুটে উঠেছে। কারণ 'মানুষ' তাদের কাছে সকলের আগে, সেই জন্যই তার সিদ্ধিলাভ প্রাপ্ত ঈশ্বরের নাম 'মনের মানুষ'। তারা জাতপাতে বিশ্বাসী না, দেব দেবীতেও না। তারা মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখদুঃখের কথার মধ্যেই, নিজেদের সাধনার গোপন কথা অনায়াসেই মিশিয়ে দিয়েছে, সাধারণের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব না। অনেকে মনে করতে পারে, বাউলরা কেবল ইন্দ্রিয় সেবা করে। আমি দেখেছি, তাদের সাধনা যে-কোনো দেহ সাধনার তুলনায় অতি কঠিন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে প্রাপ্ত বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের 'দোহা' বা গান আবিষ্কার করেছিলেন। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, "সমস্ত কথা ব্যাখ্যা করতে গেলে, অত্যন্ত অশ্লীল হয়ে পড়ে, অতএব ব্যাখ্য করছি না"। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি কি বাউল গানের প্রকৃত মর্ম জানতেন না? আমার মনে হয় জানতেন। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধর্মমতের সঙ্গে বাউলদের মানবপ্রীতিকে তিনি নিজের মতো করে মিশিয়ে নিয়েছিলেন।

যাই হোক, পৃথিবীর প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মেই, যৌনপ্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে। সম্ভবতঃ আদি মাতৃদেবী ও আদি পিতৃদেবের কল্পনা থেকেই মানুষ তার ধর্মের সঙ্গে, নিজেও যৌন প্রক্রিয়ায় জড়িয়ে পড়েছিল। এখনও তার বিস্তর নিদর্শন পাওয়া যায়। বর্তমান প্রসঙ্গে সে আলোচনা বিস্তৃত করে বলার দরকার নেই। আমরা এখন আধুনিক 'যৌন বিপ্লব'-এর কথা প্রায়ই শুনছি। এর স্বরূপ কী? প্রাচীনতম কাল থেকেই কি যৌনতা, নিরন্তর নানা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে? হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ যে যৌনতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি, এটা পরিষ্কার। 'যৌন বিপ্লব'-এর প্রবক্তারা কী বলেন, কী তাদের বিধান, আমরা তা জানবার অপেক্ষায় আছি।

# বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে

অনধিকার চর্চা বিষয়টি বড় উদ্বেগজনক। অথবা বলা ভালো, ধন্দ লাগানো। যতোবার যে-কোনো ক্ষেত্রেই সঙ্গীত নৃত্য বিষয়ে কিছু বলতে গিয়েছি বা লিখতে বসেছি, তন্মুহূর্তেই এই অধিকার-অনধিকার প্রসঙ্গটি আমার মনে কাঁটার মতো খচখচিয়ে উঠেছে। কেবল সঙ্গীত নৃত্য বিষয়েই কেন, শিল্প সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়েই মন্তব্য করবার আগে, এই প্রসঙ্গটি একটি অনিবার্য জিজ্ঞাসার ভ্রূকুটি হয়ে দেখা দিয়েছে। এমন কি, যে-বিষয়ে কিঞ্চিৎ অধিকারবোধ মনের কোণে ঠাঁই করে আছে, সেই সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়েও অনেকবার থতিয়ে গিয়েছি। দ্বন্দ্ব জেগেছে, ধন্দ লেগেছে মনে। যা বলছি, ঠিক বলছি তো ?

উদ্বেগটা একান্ত নিজের মনের। নিন্দুকের কথা ভেবে না ! কাঠঠোকরা শুকনো কাঠে ঠকঠকিয়ে ঠুকবে তাদের দীর্ঘ ধারালো চঞ্চু দিয়ে। বা কাদাখোঁচারা কাদা খুঁচিয়ে যাবে নিরন্তর, এটা তো একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন কি-না স্বাভাবিক ব্যাপার, দোয়েল শ্যামারা বিশ্বরূপের আঙ্গিনায় চিরকালই মগ্ন আর সুখী চিত্তে সঙ্গীতমুখর। এটি "একটি অতি পুরাতন কাহিনী।"

অনধিকার চর্চার উদ্বেগের কারণটা, মন্তব্যের যাথার্থ্য নিয়ে। কিন্তু অদ্যাবধি, রসের বিচারে আদৌ কোনো নিরিখের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে কী ? চোখের কোণে পিচুটি জমেছে, অন্তরে সদাই দংশনোদ্যত বিষধর, তাদের কথা আলাদা। তাঁরা হলেন ফতোয়াবাজ। ফতোয়াবাজদের কৌলীন্য, সে জাতে ঢেঁকি। সে একটি কাজই

জানে। যেখানেই থাকুক, যেখানেই যাক, তার একটাই ছক, একটাই ফতোয়া। সেই ছকের বাইরে, সে কিছুই জানে না। অতএব, সে জানে, তার বিচারে কোনো ত্রুটি নেই। অথচ আমার জ্ঞানে এমন কোনো তত্ত্বের সন্ধান মেলে নি, যা ছকে বাঁধা। ছক মানেই, চিন্তা-জগত শ্রমহীন, এক শ্রেণীর সুখীদের পরিক্রমার পথ। সৃষ্টির ক্ষেত্রে, এমন কি সে জন্মনিয়ন্ত্রণবাদীও না, একেবারেই বন্ধ্যা।

বেশ আছেন, আরামে থাকুন, চালিয়ে যান। তবে মাঝে মধ্যে, যদি অন্তরে কোনো তাগিদ থাকে, হাঁটা চলাফেরা করবেন, অন্যথায় মেদ জমে যাওয়ার ভয় আছে। ছকের বাইরে হলেও ভয়ের কিছু নেই। কারণ রসের বিচারে, তর্ক কখনো মেটেনি। ছিল, আছে, থাকবেও। কিন্তু তর্কের বাইরেও চিরকালই একটা বিষয় ছিল। আছে এবং থাকবেও। তাকে শুধু "ভালো লাগার" মতো একটি তুচ্ছতা দিয়ে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে না। যদিও অবিশ্যি রকমফেরে কথাটা তা-ই, তবে আরো প্রাণ ঢেলে বলতে ইচ্ছা করে, "বিস্ময় মুগ্ধতা"। আমার কাছে এ অনুভূতিটা আবেগের তাড়না মাত্র না। বুদ্ধি এখানে প্রাণের দরজায় দাঁড়িয়ে দরোয়ানী করে না বটে, সে প্রচ্ছন্ন থেকে মুগ্ধ হৃদয়ের তীরে তীরে কিরণ ছড়ায়। প্রাণ ও মনের এমনি একটা অবস্থায়, রসের বিচারককে বলতে ইচ্ছা করে, "তফাত্ যান।" তাত্ত্বিক মহাশয়কেও, "এদিকে নয়।"

অধিকার-অনধিকার প্রসঙ্গটি মনে এলো, গত ফেবরুয়ারি মাসের গোড়ায়, যখন হঠাৎ-ই আমার এক বন্ধুর মুখে শুনলাম, মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো মন্দির প্রাঙ্গণে, মন্দিরের পটভূমিতে, খোলা আকাশের নীচে, ভারতীয় নৃত্যশিল্পীদের শাস্ত্রীয় ( classical ) নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। তারই পাশাপাশি, খাজুরাহোর পাহাড়ের পটভূমিতে, রাত্রের খোলা মাঠে, আগুনের আলোয় নাচতে আসছেন

মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়। কে না জানেন, বিশাল মধ্যপ্রদেশের মতোই, তার আদিবাসী সম্প্রদায়ও বিশাল, বিচিত্র আর বর্ণাঢ্য। এর পিছনে ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক কারণও বর্তমান। কিন্তু সে প্রসঙ্গের কথা পরে। প্রথমেই বলা দরকার, এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ডিরেকটরেট অফ ট্যুরিজম—মধ্যপ্রদেশ। তাঁদের এই অপরূপ আয়োজনের মধ্যে কতোখানি হরিষে বিষাদ মিশেছিল, সে-কথা এখন নয়। এই মুহূর্তে তাঁদের ধন্যবাদ আর অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না। এ একমাত্র তাঁদেরই উপযুক্ত কাজ, এ কথা বলেই শুধু চুপ করে থাকা যায় না। তাঁদের এই অভিনব পরিকল্পনা আর চিন্তার জন্য, দেশবাসী মাত্রেই তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

সব সময়ে, কাগজের সব সংবাদ বা বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে পড়ে না। খাজুরাহোর এই অভিনব চিত্তহারী মহোৎসবের কোনো সংবাদ বা বিজ্ঞাপন, কলকাতার কাগজে আমার চোখে পড়েনি। জানি না, প্রচার কতোটুকু হয়েছিল, বা আদৌ কলকাতায় কোনো প্রচার হয়েছিল কি না। অথচ এবার নিয়ে, এই মহোৎসবের বয়স তিন বছর। যে বন্ধু সংবাদটি দিয়েছিলেন, আপাততঃ তাঁকেই আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা আরো এক কারণে। তিনি, সপরিবারে না বলে সদলবলে বলা সঙ্গত, চলে গিয়েছিলেন আমার আগেই। উৎসবের তারিখ ছিল ফেব্রুয়ারির এগারো থেকে আঠারো তারিখ পর্যন্ত। আমার পক্ষে খাজুরাহো এই প্রথম আর নতুন। সেই মন্দির প্রাঙ্গণে ওই রকম এক নৃত্যোৎসব হতে চলেছে। নিজের উৎসাহ আর ব্যাকুলতা থেকেই, আরো বহু ভিড়ের একটা ছবি কল্পনা করতে পারছিলাম, যা দিশাহারা করবার পক্ষে যথেষ্ট। কোথায় আশ্রয় পাবো, কিছুই জানি না। আদৌ পাবো কী না, সে-বিষয়েও যথেষ্ট উৎকণ্ঠা ছিল। এমন কি, উৎকণ্ঠা ছিল, ভায়া-এলাহবাদ বম্বে মেলে, সাতনা পৌঁছে, সেখান থেকে খাজুরাহো পৌঁছাবো কেমন করে? অন্তত সাতনা স্টেশনে নেমেই কারোর সাহায্য আমার

দরকার ছিল। কারণ, আগেই শুনেছিলাম আমাদের সেই দেশটির নাম মধ্যপ্রদেশ যার যে-কোনো দ্রষ্টব্যস্থানে যেতে হলেই, দেড়শো দুশো মিনিমাম তিনশো-চারশো কিলোমিটার পথ কিছুই নয়। রেলপথ আর রেলের সময়ের সবটাই এমন বেকায়দায়, বাসের রাস্তাই একমাত্র ভরসা। এক কথায় বাই রোড।

দেশটি বড় বলতে যে-সে বড় না, একমাত্র বস্তার জেলা-ই কেরল প্রদেশের সমান। যাই হোক, আমার সহৃদয় বন্ধুটি সব ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন। সাত্না স্টেশনে আমাকে রিসিভ করেছিলেন এলাহাবাদ ব্যাংকের ম্যানেজার, আর খাজুরাহো পৌঁছোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন তিনিই। কিন্তু এখানেও আমাকে আর একবার অধিকার-অনধিকারের প্রশ্ন খোঁচাচ্ছে এ যাত্রায় আমার ভূমিকাটা কী? আলোচক, সমালোচক, সমীক্ষক কোনো বিশেষণেই আমাকে মানায় না। সঙ্গীত নৃত্যাদি বিষয়ে সচরাচর যা দেখতে পাই। তবে সে-জবাবটা আমার আগেই দেওয়া হয়ে গিয়েছে। উৎসবের বিবরণেই, আবেগের ছোঁয়া লেগেছিল প্রাণে। মুগ্ধ বিস্ময়ের ব্যাকুল-গতি আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কল্পনা প্রতিভাত হয়েছিল স্বপ্নের মতো।

আজকাল অনেকে কথায় কথায় বলেন, পৃথিবী সত্যি ছোট। কথাটা যে সত্যি তা তো অনেক আগেই শুনেছি, "জীবন এত ছোট ক্যানে।"···তবুও, এতাবৎকাল খাজুরাহো তো আমার কাছে দুরন্ত-ই ছিল। ঘরের কোণে কোনারকের মন্দির দেখেছি একাধিকবার। খাজুরাহোর মন্দির এতোকাল ছিল, চোখে না-দেখা, বাঁশী শোনার মতো।

আগে পটভূমি, তারপরে অনুষ্ঠান। আমাদের বাঙালী মৃৎশিল্পীরা হয় তো প্রতিমার কাঠামো আর চালচিত্র আলাদা আলাদা তৈরি করে, পরে তাকে সাজান। কিন্তু প্রতিমা যখন দেখি, তখন তার পটভূমি চালচিত্র। অতএব মহোৎসবের চালচিত্রের কথা আগে। কিন্তু চালচিত্র যেমন, কেবলমাত্র একটি ডেকোরেটেড ব্যাকগ্রাউণ্ড নয়,

প্রতিমাকে ঘিরে থাকে নানা প্রতীক, গূঢ় যন্ত্রাঙ্কন অর্থবহ বিচিত্র সংকেতময় নানা মুদ্রাঙ্কিত চিত্র আমার কাছে খাজুরাহোর মন্দির-সমূহ, শাস্ত্রীয় নৃত্যাদির তেমনি এক চালচিত্র পটভূমি।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর উড়িষ্যার মন্দিরগুলো সবই দেখেছিলেন, আর উড়িষ্যাকে তিনি আখ্যা দিয়েছিলেন, মন্দির-ক্ষেত্র। মন্দিরের দেশ। তাঁর মুগ্ধতার মধ্যে একটি স্বপ্নাবেশ যেমন ছিল, ছিল তেমনি পাশাপাশি একটি রুচির বিচার। সংশয়িত জিজ্ঞাসা।

একমাত্র খাজুরাহোর মন্দিরগুলো দেখেই, মধ্যপ্রদেশকে আমার বলতে ইচ্ছা করে, মন্দিরের দেশ। তার থেকেও বেশি, আমি এসে দাঁড়ালাম যেন এক স্বপ্নময় জগতে। মন্দিরগুলো ছড়িয়ে আছে, খাজুরাহোরে কয়েক মাইলের মধ্যে, নিভৃতে। ইতিহাস বলে, খাজুরা-হোতে মন্দিরের সংখ্যা ছিল প্রায় আশি। এখন বর্তমান বিশবাইশের বেশি না। কিন্তু প্রতিটি মন্দির খুঁটিয়ে দেখে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবরণের প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ভাবনা চিন্তায় আমি নেই। তাত্ত্বিকের কাজ তাত্ত্বিক করবেন। মুগ্ধপ্রাণ পারে শুধু মহিমা কীর্তন করতে।

এখানে চোখে পড়ে না কোনো রাজপ্রাসাদ, ধনিকশ্রেণীর ইমারত, অথচ আকাশে বিদ্ধ হয়ে আছে মন্দিরের উচ্চ শিখর। বিশারদদের মতে, যে-সব পাথর দিয়ে মন্দিরগাত্রের এই দেবদেবী, নরনারী, পশু-পক্ষীর জীবনলীলাকে রূপদান করা হয়েছে, যা স্তব্ধ, কিন্তু প্রাণহীন ভাবতে পারি না, বাস্তব অবাস্তবের মাঝামাঝি, এক স্বপ্নময় জগতে চলমান অনুভূত হয়, সেই সব পাথর আনা হয়েছিল কেন্ নদীর তীরে, পান্না হীরক খনির পাহাড় কেটে। দূর থেকে, সহসা যে-সব মূর্তিকে মনে হয় সাদা, তার অধিকাংশই সাদা নয়। শিল্পীরা সম্ভবত খুঁজে-ছিলেন সেই সব বালিপাথর ( sand stone ), যার মধ্যে মিশেছিল মানুষের গায়ের রঙের আভা। সেইজন্যই কি খাজুরাহোর রমণী-পুরুষের মূর্তিগুলোর রং অধিকাংশই কিঞ্চিৎ গোলাপী আভা, ঈষৎ পীতাভ, হালকা হলুদ ?

জানি না। আমি দেব-দেবী জানি না, যক্ষরক্ষ অপ্সরা সুরসুন্দরী বুঝি না, আপন হৃদয়ের স্পন্দন শুনতে শুনতেও নিজেরই আর্তজিজ্ঞাসা শুনি, কেন আমি সেই সব শিল্পীর হাতের পাথর প্রতিমা হলাম না? হাজার বছরের ইতিহাস আর প্রত্নতত্ত্বের সাক্ষী হয়ে থাকবার জন্য না। আমি থাকতে চাই এই রূপ ও লাবণ্যের, বীরত্ব ও মহত্ত্বের, দৈনন্দিন জীবন-লীলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে। সেই সামান্য গাইড বুকে উদ্ধৃত ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতার পংক্তি কয়টি এখানে দাঁড়িয়ে, আমারও বলতে ইচ্ছা করছে :

আমি কবি দেহের এবং
আমি কবি আত্মার
আমার আছে স্বর্গের সুখ
এবং নরকের যন্ত্রণা আছে আমার
আমি কবি রমণীর
যেমন পুরুষের
এবং আমি বলি যেমন মহৎ
রমণী জন্ম তেমনি পুরুষের···
আমি বলেছি, যে আত্মা
দেহের অধিক নয়
এবং বলেছি
আত্মার অধিক নয় দেহ।
এবং কিছুই না নয় ঈশ্বর
স্বয়ং একজনের থেকে অধিকতর মহৎ
এই মোর গান ...

যা আমাকে বই পড়ে জানতে হয়, তা মন্দিরের গঠনশৈলী। খাজুরাহোর কোনো মন্দিরই প্রাচীর ঘেরা নয় এবং অধিকাংশ মন্দিরই হিন্দু

ধ্যানধারণার ধারক বাহক। কিছু জৈন মন্দিরও আছে। মন্তব্য করতে দ্বিধা হয়, তবু ধারণা করি, জৈন মন্দিরাদি পরবর্তীকালের সৃষ্টি। "জগতী"র ওপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত, আমাকে মনে করিয়ে দেয় যেন জগতী তলে মানব মানবী, তাদের গৃহ সংসার সব কিছু নিয়ে চলেছে নিত্য কালের প্রবাহে। অধিষ্ঠানের ওপরে জগতী, জগতীর ওপরেই অর্ধমণ্ডপ, তার ওপরে মণ্ডপ, মণ্ডপের পরে অন্তরাল এবং গর্ভগৃহ। বিগ্রহ অবস্থান করেন গর্ভগৃহে। মণ্ডপ কখনো কখনো মহামণ্ডপ। মানুষের দেহ যেমন ভর করে থাকে জঙ্ঘার ওপর, মন্দিরের মধ্যস্থলের কোনো কোনো স্থানকে তেমনি বলা হয়েছে জঙ্ঘী, যে শক্ত পাথরের দেওয়ালের ওপরে, মন্দির মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে উচ্চ শিখরে।

দেওয়াল? কথাটা একদিকে সত্যি, কিন্তু খাজুরাহোর সমস্ত মন্দিরের দেওয়াল, থাম, ছাদ, ছাদের বিম্, প্রবেশ দ্বার, অধিস্থান, অধিস্থান থেকে গর্ভগৃহ, তার ভিতর বাহির সবখানেই নানা ভঙ্গিমায় নানারূপে, নরনারীর মিছিল। কোথাও পারিবারিক, কোথাও দেবদেবীর নানা ক্রীড়া। নামে তাঁরা অনেক অনেক কিছু। কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি, "আমি কবি রমণীর যেমন পুরুষের।"···

কোনো কীর্তিমান কবি লিখেছিলেন "তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?" আমার বিনীত আর অকুণ্ঠ জবাব, পাইনি। কিন্তু খাজুরাহোর মন্দিরের রমণীর নিশ্বাস যেন কুসুমের গন্ধে স্পর্শ করেছে আমার শরীর। শালপ্রাংশু বৃষস্কন্ধ পুরুষের বলবীর্যের উত্তাপ লেগেছে আমার গায়ে। অপ্সরা অথবা সুরসুন্দরী, (nymphs) ওঁদের যাই বলো ঈষৎ গোলাপী বা পীত আভাযুক্ত এই সব অপরূপ রমণীরা, যারা ক্ষীণ কটি, গুরু নিতম্বিনী, বিল্বফল সদৃশ সুস্তনী, যাদের এক একজনের চোখে মুখে, ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি, ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়ার কারণে, তারা সকলেই যেন আমার চেনা-অচেনার মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাচিয়ে দিচ্ছে রক্তধারা।

যেখানে তারা নেচে চলেছে নানা ভঙ্গিমায়, তখন সে একান্ত

আপন ছন্দে আত্মহারা। কারোর ঠোঁটে বিকট হাসি, চোখের কোণে হাসির ঝিলিক। কারোর অভিব্যক্তিতে আর্ত আবেগ, দেহের ছন্দে যা হয়ে উঠেছে জীবন্ত, ব্যাকুল কেউ দ্রুততালের ছন্দে, দৃষ্টি দিশাহারা। এ কি কেবলই পাথরের মায়া ? "তুমি কি কেবলই ছবি ?" কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে হাতের শতদল পদ্ম ? তোমার নাচের ভঙ্গিতেও কি মুকুর একটি সরঞ্জাম ? অথবা তাও তুমি নিবেদন কর তোমার দেবতাকে ? কে পরালে তোমার নগ্ন বক্ষে এমন চন্দ্রহার। আশ্চর্য, তোমার হাতে ছাড়া আর কার হাতেই বা মানায় এমন কঙ্কণ।

দেখছি, উদ্ধতবক্ষ নারী, কোমরের কাছে একটি পা তুলে পরে নিচ্ছে পায়ের অলঙ্কার। স্পষ্টতই, খুলে পড়েছিল কোনো এক মুহূর্তে। কিন্তু অন্য এক রমণী নতমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে দুই জঙ্ঘার মধ্যস্থলে, পা তুলে, কী খুঁটে তুলছে পায়ের তলা থেকে ? চোখে তার ভ্রূকুটি, একটু বা যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখ। বলে দেবার দরকার হয় না, বিঁধে যাওয়া কাঁটা তুলছে, পায়ের তলা থেকে। বড় চেনা ছবি। কোথায় যেন দেখে-ছিলাম ? কোথায় যেতে যেতে না কি কোনো গৃহাঙ্গনেই ? ইচ্ছা কি করে না, ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিই, তুলে নিই ওই সুকোমল চরণ ? মুক্ত করি কাঁটা ?

শুনি, রচয়িতার প্রকাশের ভাষা যখন এক গভীর ও উচ্চতায় ( Hightened ) পৌঁছায়, তখন তা হয়ে ওঠে কবিতা। শিল্পীরও কি তাই। যখন তার সৃষ্টি কর্ম পৌঁছায় কল্পনার শীর্ষে, তখন সে বোধ হয় ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যথায় রমণী ও পুরুষের এমন মুহূর্ত আশ্চর্য স্বাধীন এমন উদ্ধত অথচ নম্র, অতি অধরা অথচ স্বাভাবিক, আর এত আশ্চর্য স্বাধীন তাদের ক্রীড়া ও ভঙ্গিমা, কেমন করে রূপ পায় বর্তমানের দু-একজন আধুনিক শিল্পীর তুলির টানে, এমন বলিষ্ঠ মূর্তি আমার চোখে পড়েছে।

কিন্তু এই যে রমণী, একে একে খুলে ফেলছে তার প্রতিটি অলঙ্কার আর একজন হাই তুলেছে, অন্যে ভেজা কাপড় শরীর থেকে খুলে জল

নিংড়াচ্ছে, অপর একজন সামনের দিক পিছন ফিরে নত হয়ে কিছু তুলে নিচ্ছে, কেউ বা অন্যমনস্ক আবেগে নিজের নগ্ন বক্ষে হাত রেখেছে, দেখে মনে হয়, সে স্বাধীনভাবে আপন গৃহেই রয়েছে. এমন আত্মমগ্ন চরিত্র সকল কালের সৃষ্টিকে যেন ম্লান করে দিয়েছে। কখনো সে চিবুকে রেখেছে হাত, কখনো ঠোঁটে রেখেছে তর্জনী। এটা কোনো ইঙ্গিত বা ইশারা না, অন্যমনস্ক ভাবনার অভিব্যক্তি তাদের মুখে। কেউ গাছের ডাল নুইয়ে ফল পাড়ে, কেউ বা হাতে আরশি দেখে, ডান হাতে চুলের খোপা গোছায়। চোখে কাজল আঁকে কেউ, কেউ খেলা করে বর্তুলখণ্ড নিয়ে, পুষ্পযানে দোল খায়, চন্দনে সাজায় শরীর। কারোর ঠোঁটের ও চোখের কূলে শুধু অপার রহস্যের হাসি। সন্তান স্নেহে বিগলিত মায়ের কোলে শিশু।

মন্দিরের অধিস্থানের গা থেকে (Basement panel) যদি শুরু করি, সেখানে নারীর প্রবেশাধিকার প্রায় নেই। কারণ জীবন ও জগৎ মাঝে যা অনিবার্য, পুরুষরা সেখানে যুদ্ধে লিপ্ত। সেখানে খোলা কৃপাণ আর তীরে শর যোজনা করে ছুটে চলেছে পদাতিক বাহিনী। অগ্রে নানা অস্ত্রে সজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনী, তারও আগে হস্তীযূথবাহী যোদ্ধারা। কখনো ধারাবাহিক দ্রুত গতি কখনো মুখোমুখি যুদ্ধ। নিবিড় হয়ে দেখতে দেখতে গন্ধে পাই যেন ঘামের ঘ্রাণ, শুনতে পাই হুংকার, আহতের আর্তনাদ, হস্তীর বৃংহ, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি। স্তব্ধ, কিন্তু এমনই আশ্চর্য প্রাণময়, মাছ গেঁথে যাওয়া বাঁকানো ছিপের মতো অশ্বের স্ফুরিত নাসারন্ধ্র বাঁকানো মুখ সহসাই যেন বেরিয়ে এসেছে মন্দিরের গা থেকে। শত্রু সৈন্য পদদলিত হচ্ছে হাতীর পায়ের তলায়, কেউ বা পলায়মান। কোথাও মুখোমুখি হাতাহাতি যুদ্ধ।

এই চিত্রেরই মাঝে মাঝে চোখে পড়ে কোনো এক শান্ত গম্ভীর ব্যক্তি হাত তুলে কিছু বলছেন, দু পাশের সারি সারি শ্রোতারা আসীন। যেন যুদ্ধের অবকাশকালে কোনো জ্ঞানী কিছু উপদেশ

দিচ্ছেন, অথবা শোনাচ্ছেন কোনো সামরিক বিধির বিষয়। এই যুদ্ধ চিত্রের মধ্যেই সহসা কোথাও কোথাও নারীর প্রবেশ যারা একাধিক পুরুষের বাহুবন্দী। কল্পনা করতে ইচ্ছা করে, এ হয়তো বিজয়ী সেনাদের স্বাভাবিক প্রাপ্তির উল্লাস। তবু এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াতে হয়, যখন দেখি, এক সৈনিক অশ্বিনী মৈথুনে উদ্যত। আমি নিজে এর কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি। মধ্যপ্রদেশের ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ারের একজন কর্মী—তিনি একজন শিল্পীও, আমাকে শোনালেন, বহুকাল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন সৈনিক নিতান্ত কামনা-তাড়িত হয়ে এই মুহূর্তে বিকারগ্রস্ত, লিপ্ত হতে চলেছে পশু-মৈথুনে।

এই ব্যাখ্যা মানতে পারি বা না পারি, জীবনের অভিজ্ঞতা আমাদের জানিয়ে দেয়, মানুষের দ্বারা অনেক কিছুই সম্ভব।

খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রের এই যুদ্ধ ও জীবনযাত্রার নানা চিত্রের মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা মহিমময় সৃষ্টি রমণী পুরুষদের আদি ও অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষার, অনায়াস ও নগ্ন প্রকাশ, নাম যার যৌবন। যে সব ক্রীড়ারত মূর্তিগুলোকে বলা হয়েছে মিথুন মূর্তি। অথবা যুগল-বন্দী। একি সৃষ্টির উল্লাস, না কি জীবনেরই আকাঙ্ক্ষার এক বিপুল আনন্দ। আমি জানি না, কেন কেউ কেউ মিথুন মূর্তিগুলোর অভিব্যক্তিকে স্বর্গীয় আখ্যা দিয়েছেন। আমি দেখেছি, কামনায় উদ্বেল, যৌনাসনে উভয়ে প্রগাঢ়ভাবে আপনাতে আপনি মগ্ন, আশ্লেষ চুম্বনে যেন পিপাসিত প্রাণ তৃপ্ত—অথচ অতৃপ্ত, যা একান্ত মানবিক।

মানুষের ক্ষেত্রে কাম যদি কেবল মাত্র বীভৎস রস না হয়, হওয়াটাই অবিশ্বাস্য আর অযৌক্তিক, তবে এইসব মিথুন মূর্তির মধ্যে আমি দেখছি কেবল জগত পারাবারের চলমান স্বভাব সৌন্দর্য। কিন্তু মহাকাল অন্ধ, তিনি নিরন্তর অতি বেগে ধাবমান, আর তাঁর রথচক্রের আঘাতে ধ্যানধারণা মানসিকতা রুচি সকলই কেবল অতীত প্রাপ্ত হয়। কিন্তু হে বোদ্ধা, জীবনের বিচারক, শুনতে ইচ্ছা করে তোমার বাণী, মানুষ কি ত্যাগ করেছে বিপরীত বিহার? কামশাস্ত্রের মতো যত

রূপ-অরূপের খেলা ? বরং, অবাক হয়েছি সেই রমণী মূর্তির দিকে তাকিয়ে, যে যুগলবন্দী ক্রীড়ারত রমণী পুরুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। সহসা মনে হয়, রমণী লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অন্য পাশের রমণীর আপন অঙ্গে হস্তাবলেপ অথবা বক্ষমর্দন এবং মুখের বাসনা ব্যাকুলতা অন্য ভাবনা এনে দেয়। বুঝতে পারি, চারি পাশের নানান জীবনলীলার মাঝখানে অন্য এক পরিবেশে রমণী পুরুষেরা চুম্বনে আলিঙ্গনে রতিবিহারে মগ্ন। প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডেই যেন জীবননাট্যের নানা দৃশ্য উপস্থিত। অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার মধ্যেও এক একটি পরিবেশ বিচ্ছিন্ন, চরিত্রবৃন্দ ভিন্ন। অন্যান্য সব মূর্তির মতই মিথুন মূর্তিগুলোও এমনই প্রাণবন্ত, এমন আশ্চর্য তাদের দেহসৌষ্ঠব, এমনই অনায়াসে তারা, ক্ষেত্রবিশেষে দুরূহ আসনে ক্রীড়ারত, আমাদের সীমায়িত শক্তির তুলনায় তা যেন অনেকটাই অসাধারণ।

কারা তাঁরা, কোন্ সেই শিল্পী বাহিনী, হাজার বছর আগে এই আশ্চর্য রূপ দান করেছিলেন পাথরে ? আমি জানি, এক বাক্যে সবাই আমাকে ইতিহাসের সন্ধান দেবেন, এ সবই চান্দেলা রাজবংশের কীর্তি। প্রায় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে, চান্দেলা রাজবংশের রাজত্বে এই সব মন্দিরসমূহের সৃষ্টি। কিন্তু রাজবংশের উৎসাহে, অর্থানুকূল্যে অথবা এমনকি যদি কারো কারো মতানুযায়ী মেনেই নিই, রাজকীয় শাসনের প্রতাপে ও হুকুমে, এই মন্দির তৈরি হয়েছিল, তবু প্রশ্ন থেকে যায়, তাঁরা কারা ? সেই সব শিল্পীরা ?

একটা প্রচলিত প্রবাদ কোনো কোনো মহল থেকে প্রচারিত আছে, স্বয়ং বিশ্বকর্মা এই সব মন্দিরের স্রষ্টা। এমন কোনো স্বর্গীয় ভাবনা বা বিশ্বাস আমার নেই, যদিও অনুমান করতে পারি, বিশ্বকর্মাও যদি করে থাকেন, তবে তিনি বা তাঁদের শ্রেণীরা এই পৃথিবীর মানুষ। তার থেকেও বেশি, এই ভারতেরই মানুষ। কিন্তু সেই তো এক কথাই ফিরে আসবে। মহাকালের নির্দয় রথচক্রতলে সকলই অতীত।

গ্রহের অয়ন চলনের প্রতিটি মুহূর্তই অতীতের গর্ভে বিলীয়মান হয়ে চলেছে।

কিন্তু সেই সব শিল্পীদের জীবন-যাপন ধ্যানধারণা কল্পনা ও সৃষ্টি আমাদের চিরকাল বিস্মিত ব্যথায় কেবল আহত করেই রাখবে। কোনো কবি কি পারেন না সেই দুরন্ত পরিশ্রমী অপরূপ কল্পনাশ্রয়ী শিল্পীদের বংশধরদের সন্ধানের জন্য একটা কবিতা লিখতে? ঐতিহাসিকেরা তো ধরা দিলেন না। যখন কোনারকের মন্দির দেখেছিলাম, তখনো এই ব্যাকুল বিস্মিত অনুসন্ধিৎসা আমার মনে জেগেছিল।

তারপরে শেষ কথা, মন্দিরগাত্রে কেন এই অকুণ্ঠ জীবন লীলা?

অনেকেই নানান কারণ দেখিয়েছেন। স্বর্গীয়, ধর্মীয়, চিত্তশুদ্ধি-করণ, কাম রাজসিক বিলাসিতা, এমন কি কারো কারো মতে, প্রাচীন-কালে এই সব সৃষ্টিই ছিল কামসূত্রের শিক্ষা। আবার অনেকেই অনায়াসে উচ্চারণ করেছেন, অশ্লীল, কদর্য, বিকৃত। স্বয়ং বলেন্দ্র-নাথও কোনারক মন্দির সম্পর্কে এক নিবন্ধে এক জায়গায় 'কুৎসিত কল্পনা' বলেছেন, আবার সেই নিবন্ধেরই অন্য জায়গায় তিনি যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃতির লোভ সংবরণ করতে পারছি না: 'তবে কি মায়া? এ কি এই সংসার খেলার একটা রূপক? বুঝান যে, চারি দিকে মদন মন যৌবন লইয়া নিত্য যে আন্দোলন উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে অন্তর কিরূপে অবিচলিত শান্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবি হৃদয় তোমার মন্দির দেখিয়া মনে করে বিশ্ব-সংসারেরও বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্যের মত—আপন আপন বিচিত্র জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে মুদ্রিত হইতেছি; কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন, এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না।—বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক হইতে আসিয়া মিশিয়াছে—শুধু এ পিঠ ও পিঠ, শুধু ভিতর বাহির। শুধু দেহ মন।' ..

বলেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই আমি কল্পনা করেছি, খাজুরাহোর প্রতিটি মন্দিরই বিশ্বের প্রতীক। জীবন যৌবন যুদ্ধ গৃহ সংসার পশু-পালন, জীবন নিরন্তর আপন প্রবাহে চলেছে। আর এই চলমান বিশ্বরূপের অন্তরে, আমাদের হৃদয়ের হারানো বিশ্বাস অবস্থান করছে, যাকে খুঁজে ফিরছি জীবনকাল ধরে।

এই বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে যে নৃত্যের মহোৎসব শুরু হতে চলেছে পরবর্তী অংশে সেই চিত্র আঁকব।

অতঃপর নৃত্যের মহোৎসব এই বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে। যা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে। কেবল বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণেই বা বলি কেন? বাউলের 'অধর ধরার' অঙ্গনে বলতেই বা বাধা কোথায়। একদিক থেকে তো অধর ধরারই সামিল। শাস্ত্রীয় নৃত্য যে! ক্লাসিক্যাল ড্যান্স বলতে ওই কথাটাই বুঝেছি। অতএব, অধিকার অনধিকারের জিজ্ঞাসাটা আবার ফোঁস করে উঠতে চাইছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের বুঝি না কিছুই। কাকে বলে ভরতনাট্যম্, কত্থকের রূপ আর ব্যাখ্যাই বা কী, দেশের সঙ্গে নাম মিলিয়ে কোনটি ওড়িশি বা কুচিপুড়ি, আমার কাছে এ সবই কিছু নাম ছাড়া আর কিছু না।

কিন্তু কেবল নামের ফেরে মানুষ ফেরে, সেও তো ভাবি বেয়াকুফি। যে মন্ত্র তন্ত্র জানে না, সে পূজায় বসতে না পারে, প্রতিমা দেখে মুগ্ধ হতে বাধা কোথায়? সাধন ভজন না জেনেও যে ধ্যানী, সে কবি। এমন কি সে কখন বীভৎস কিছু আঁকে, তখনো শিল্পীর মুগ্ধতাজনিত। সে-গীত তো আমি আগেই গেয়ে রেখেছি। আমি তাত্ত্বিক না। সমালোচকের ছুরিকাঁচি নেই আমার হাতে, যা দিয়ে ছিঁড়ে কেটে

দেখাতে পারি ভালো মন্দ। বিজ্ঞ নই, যে ব্যাখ্যা করি। রসিকও না, যে জায়গা বুঝে হাততালি দিয়ে বলি, বাহ্‌বা! বাহ্‌বা! কেয়াবাৎ। আমি ছুটে এসেছি, খাজুরাহোর বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে, মুক্ত-মঞ্চে নৃত্যের মহোৎসবে। সেই হিসাবে, আমি রসিকলাল নই কোনো মতেই। মুগ্ধলাল—যাকে বলে মুগ্ধ-প্রাণ।

শিল্পীদের নামের তালিকা আমার হাতে। তার আগে অবিশ্যি একটি কথা। উৎসবের শুরুর তারিখ ছিল ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ পর্যন্ত। কিন্তু প্রথম দিকের তিন দিনের উৎসব দেখা আমার ভাগ্যে ঘটেনি। কত্থক নৃত্যের শুরুতেই দেখেছি 'সরস্বতী বন্দনা'। দেখেছি বললে ভুল বলা হয়। জেনেছি কলকাতার এক উচ্চমানের কত্থক নৃত্যশিল্পীর কাছ থেকেই। এই জানার বিষয়ে একদিক থেকে তিনি আমার গুরুর কাজ করেছেন। তাঁর কথায় আমি পরে আসছি। তবু, নিজে নৃত্যের শিল্পী না হয়েও, তাঁকে গুরু বললাম এই কারণে, আমি গুরুবাদীদের সেই গানটিকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, 'গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন! তোর অথিক ( অঠিক ? ) গুরু, পাথিক গুরু, গুরু অগণন।' সেই হিসাবে গুরুর কোনো বয়স নেই, শ্রেণী নেই। যাঁর কাছে যে-টুকু অজ্ঞাতের সন্ধান মেলে, তিনিই গুরু।

শুরুর তিন দিনের উৎসব যে আমি দেখতে পাইনি, তার কারণও সরস্বতী বন্দনা। কাজটা খাজুরাহোতে গিয়ে, শিল্পীদের সঙ্গেই সেরে নিতে পারা যেতো। যে-যাই বলুক, সরস্বতী বন্দনাটা আমার ক্ষেত্রে অনিবার্য, এবং অনিবার্যভাবেই তার আয়োজন গৃহাঙ্গনেই বরাবর ঘটে থাকে। গৃহোৎসব বলেও একটা কথা আছে তো। ওটা ধারাবাহিকতার অন্তর্গত।

তিন দিনের নামের তালিকায় দেখছি, শোভনা রাধাকৃষ্ণণ—ভরত-নাট্যমের শিল্পী রাজা এবং রাধা রেড্ডি যুগল—কুচিপুড়ি নৃত্যের শিল্পী, কুমারী রসিকা খান্না—ভরতনাট্যম্। চতুর্থ দিনে, ওড়িশি নৃত্যের শিল্পী সংযুক্তা পাণিগ্রাহী আমার সামনে। ভরতনাট্যমের সঙ্গে কোথায়

কতোখানি এই নৃত্যের তফাত আমি খুব পরিষ্কার বুঝতে পারি না। পোশাক এবং নাচের সঙ্গে গানের পদ ছাড়া। কিন্তু আমার বিমোহিত বিস্ময় সেখানে না। এই সব কীর্তিমতী শিল্পীদের স্ব নামে পরিচয় সর্বত্র, নন্দিত তাঁরা দেশে দেশে, অথচ ব্যতিক্রম ঘটে যায় যেন এই মন্দির প্রাঙ্গণে।

আমি দেখি খাজুরাহোর কৃষ্ণনীল আকাশে প্রায় পূর্ণ চন্দ্র, জ্যোৎস্না লোকের ছায়া ও মায়ায় মন্দিরের বিশ্বরূপ গাত্র থেকে সুরসুন্দরী নেমে আসে অপরূপ নৃত্যের ছন্দে। দিনের আলোয় যাদের দেখে সন্দিগ্ধ ছিল মন, তুমি কি কেবল শিল্পীর হাতে গড়া পাথরের মূর্তি অথচ যেন পেয়েছিলাম নিঃশ্বাসের সুগন্ধ স্পর্শ এখন রোমাঞ্চিত হয়ে দেখি, তুমি মূর্তিমতী রমণী নেমে আসো সেই কোন্ দূরকালের নর্তকীর বেশে।

সুরসুন্দরী অথবা অপ্সরা? পুরাণকার—প্রাচীন ঐতিহাসিকরা আমাদের দিয়ে গিয়েছেন সুরলোক-স্বর্গলোক-অন্তরীক্ষের সন্ধান, মানবেরই ভিন্ন নামের বিভিন্ন জাতির পরিচয়। বিভিন্ন রমণীকুলেরই নানা নাম, সুর-সুন্দরী বা অপ্সরা যে-নামেই ডাকি। চির অপরিচয়ের অন্ধকারে ঢাকা, নামহীন সেই শিল্পীরা হাজার বছর আগে, তোমাকে অবিকল স্থাপিত করে রেখে গিয়েছিলেন এই মন্দিরগাত্রে। নিশিথিনী তুমি, অভিসারিকা, হাজার বছরের পাথর প্রতিমা, এই জ্যোৎস্নালোকের মাথায় নেমে আসো রক্তমাংসের মানবী শরীর নিয়ে। জয়দেবের গীতগোবিন্দ থেকে সঙ্গীতে উচ্চারিত হয়:

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানাসি বেদং বিহিতবহিত্রচরিত্রমখেদম্॥

কেশব ধৃতমীনশরীর জয়জগদীশ হরে॥

নৃত্যের ছন্দে তুমি দেববন্দনা কর। কিন্তু দেখছি, খাজুরাহোর এই বিশ্বরূপের প্রাঙ্গণে চন্দ্রই সর্বাগ্রে। চন্দ্রাহত এক রমণীই, এইসব মন্দির সৃষ্টির প্রেরণাকারী চান্দেলা রাজবংশের প্রথম পুরুষের জন্মদাত্রী। ইতিহাসের বাস্তবতা যখন তার কালের ঝাপটায় বাতাহত

হয়, তখন কি জন্ম নেয় কিংবদন্তী? কিংবদন্তীর আড়ালে কি লুকিয়ে থাকে বাস্তবের কোনো সংকেত বা ইশারা?

সে-বিচারের ভার থাক ঐতিহাসিকের ওপর। কারণ চান্দেলা রাজবংশের ইতিহাস দশম শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে শুরু। অবিশ্যি ঐতিহাসিক ঘটনার সূত্রপাতে, কিংবদন্তী প্রচার হাজার বছরের মুখ চেয়ে থাকে না। কিংবদন্তী জন্ম নেয় যুগে যুগে, এমন কি আধুনিককালেও।

এই মুহূর্তে, এই মায়াময় জ্যোৎস্নালোকে, মন্দিরের পটভূমিতে, মহিমময়ী নর্তকীর অপরূপ নৃত্যের সুষমায়, সেই কিংবদন্তী যেন এক স্বপ্নের মতো আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। কিংবদন্তীর নায়িকা এক ষোড়শী রূপবতী। নাম তার হেমবতী। গহরওয়ারের শাসক ইন্দ্রজিতের পারিবারিক পুরোহিত হেমরাজের কন্যা। বিয়ে হয়েছিল শৈশবেই, কিন্তু ইন্দ্রের অভিশাপে সে বিধবা হয়েছিল অল্প বয়সেই। কিংবদন্তী তো! সব কথাই তার মনের মতো। কারণ কেন ইন্দ্রের অভিশাপ, কী বা নাম ছিল হিমবতীর স্বামীর, কিংবদন্তীতে তার কোনো উল্লেখ নেই। দিনে দিনে হেমবতী যতো বড় হয়ে উঠতে লাগলো, যৌবন আর রূপরাশিও তাকে করে তুললো অপরূপা। কল্পলোকের সুরসুন্দরীর মতোই।...

এক গ্রীষ্মের রাত্রে, চোখে তার ঘুম নেই, অনুভূতির জগতে এক অস্থিরতা, এক আশ্চর্য অবোধ বাসনা তার প্রাণে। ঘর ছেড়ে সে গেল এক পদ্মপুকুরে, নাম যার রতিসায়র। রতিসায়রের শীতল জলে ডুব দিয়ে সুখী ও উজ্জ্বলতর হলো। দেহের বস্ত্র ছুঁড়ে দিয়ে, নগ্ন সুন্দরী রতিসায়রের জলে কেলি করতে লাগলো। পদ্মফুলবন্ধু চন্দ্র আকাশ থেকে রমণীর সেই রূপলাবণ্য দেখা মাত্র, বিদ্ধ হলেন মদনশরে। নেমে এলেন ধরাতলে, আলিঙ্গন করলেন হেমবতীকে। হেমবতী যেন জানতেও পারলো না, মদির আচ্ছন্নতায় সে এক পুরুষের দেহলগ্ন। কোথা দিয়ে রাত্রি কেটে গেল, দুজনের কারোরই খেয়াল হলো না।

সূর্যোদয়ের পূর্বে খেয়াল হলো চন্দ্রের. তিনি তাড়াতাড়ি বিদায় নেবার উদ্যোগ করলেন। হেমবতীরও তখন সংবিত ফিরলো, যেন সেই বিদায়কে সে অনিবার্য ভাবেনি. তাই চন্দ্রকে অভিশাপ দিতে গেল। চন্দ্র বললেন, 'শোন সুন্দরী, আমাকে অভিশাপ দিও না, বরং জেনে সুখী হও, তোমার গর্ভজাত সন্তান হবে এক সুবিশাল রাজ্যের অধিকারী, দুর্ধর্ষ রাজা।'...

হেমবতী বললেন, 'কিন্তু স্বামী-হীনা আমি, কী গতি হবে আমার এই কলঙ্কের ?'...চন্দ্র বললেন, 'তোমার ছেলের জন্ম হবে কর্ণবতী নদীতীরে। ওকে নিয়ে যেও খাজুরাহোতে, থেকো ত্যাগ ও সাধনার মধ্যে। মহোবাতে ও রাজত্ব করবে। ওর ভাগ্যে আছে পরশ পাথর, যা দিয়ে লোহা স্পর্শ করলে সোনা হবে। কালিনজর পাহাড়ে ও এক বিরাট দুর্গ তৈরি করবে। ছেলের ষোল বছর বয়সের সময় তুমি যজ্ঞ করলে, তোমার সকল পাপমোচন হয়ে যাবে।'...

চান্দেলা রাজবংশ প্রথম থেকেই চন্দ্রোপাসক। কিংবদন্তী —কিংবদন্তীই, তার সত্যাসত্য যাচাইয়ের প্রশ্ন ওঠে না। এখানে কর্ণবতী নদীর কথা আছে, কিন্তু হেমবতী, কুন্তীর মতো লজ্জা-মোচনের দায়ে, পুত্রকে জলে ভাসিয়ে দেয়নি। আমি ঐতিহাসিক না, কিন্তু পুরাণকার ইতিহাসবেত্তাদের সংকেতগুলো ভুলতে পারি না। তাই আমার একান্ত মানব মনে স্বতোৎসারিত জিজ্ঞাসা, আকাশের চন্দ্র কুহেলিতে ঢাকা। কে সেই প্রেমিক, যিনি অপরূপ রূপসীর মনোহরণ করেছিলেন ? ভাবতে ইচ্ছা করে, তিনি ছিলেন চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল পুরুষ, হয়তো ছিলেন মহাপরাক্রমশালীও এবং রমণীমোহন। চিরকাল থেকে গেলেন ইতিহাসের আড়ালে।

থাক কিংবদন্তী, ইতিহাসও থাক। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত খাজুরাহো, খাজুরাহোর মন্দির এখন স্বপ্নলোক। আর সেই স্বপ্নলোক থেকে নেমে আসে নর্তকী, খ্যাতনামা নর্তকীর ছদ্মবেশে। হেমবতীর কথা ভুলি কেমন করে ? এই যে দেখি, নর্তকী হাঁটু মুড়ে, দু পায়ের

অপরূপ ভঙ্গিতে নিতম্বে বাঁক নিয়ে বসে, চন্দন বাটে ও বক্ষে লেপন করে, শুনি জয়দেবের রাধার স্বগতোক্তি গান, তখন আমার ব্যাকুল চোখ বারে বারে ছুটে যায় জ্যোৎস্নালোকের মায়াময় মন্দির গাত্রে। এই নর্তকীকে যে আমি অবিকল দেখেছিলাম পাথরের মূর্তিতে, যদিও তখনো ধন্দ ছিল, সে কি কেবলই পাথর? কোনো কালে ছিলে না কি রক্তমাংসের মানবী, দাঁড়াওনি এসে শিল্পীর সামনে?

দাঁড়িয়েছিলে নিশ্চয়ই। হয় তো এই খ্যাতনামা নর্তকীর মতো এমন জনসমক্ষে এত আয়োজনের মধ্যে না। দেবতার বিগ্রহের পূজারিণী, তুমি ছিলে দেবদাসী। উত্তর মধ্যভারতের কথা জানি না, দক্ষিণ ভারতে মন্দিরেই তোমার প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীকালে, পূর্বাঞ্চলের উড়িষ্যায়। কিন্তু খাজুরাহোর সেই নামহীন শিল্পীরা কোথায় তোমার দেখা পেয়েছিল? চান্দেলারাজের মহোবা বা কালিনজরের প্রমোদকক্ষে? অথবা সেখানকার মন্দিরেও তোমরা নিজেদের উৎসর্গ করেছিলে?

তা-ই যদি হবে, শিল্পী এমন নিবিড়রূপে তোমাকে গড়েছিল কেমন করে? সকল শিল্পীকেই আমার জিজ্ঞাসা, যে কখনো আসেনি তার নিবিড় ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, সে কেমন করে রমণীর এই জীবন্ত মূর্তি গড়েছিল? সেই জন্য এই নামহীন শিল্পীদের উদ্দেশ্যে আমার বলতে ইচ্ছা করে "তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!"

এই মুহূর্তেই একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। বর্তমান ভোপাল শহর থেকে প্রায় পনের কুড়ি কিলোমিটার দূরে ভোজপুর গিয়েছিলাম। সেখানে পাহাড়ের চূড়ায় আছে এক শিব মন্দির। মহাদেবের মন্দিরের বিগ্রহ মাত্রেই লিঙ্গ। সেই মন্দির আর তার ভাস্কর্য দর্শনমাত্রেই খাজুরাহোর মন্দির সমূহের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। মন্দিরটি নাকি ভোজরাজের আনুকূল্যে সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, মন্দিরটি অসমাপ্ত। সম্মুখের অংশর কাজ অনেকখানিই শেষ করা গিয়েছিল, কিন্তু খিলানের উপরিভাগে, শিখর পর্যন্ত খাড়া

করা হয়ে ওঠেনি। আমার আজ পর্যন্ত দেখা সমস্ত শিবলিঙ্গের মধ্যে এইটি কেবল সুবৃহৎ না, পাথরের এমন মার্জিত উজ্জ্বলতা আর কোথাও দেখিনি।

ভোজপুরের এই মহাদেব মন্দিরের দুই পাশে ও পিছনের দেওয়ালে যেন কাজ শুরু হয়েছিল মাত্র। বিভিন্ন রমণী পুরুষের মূর্তিগুলো যথাস্থানে প্রোথিত করা হয়ে ওঠেনি, মন্দিরের বিশাল চত্বরের আশেপাশেই বহু অতুলনীয় ভঙ্গির মূর্তিগুলো ইতস্তত ছড়ানো। কিন্তু এক বাস্তব সূত্রের সন্ধান এখানেই দেখতে পেলাম। মন্দিরের পাহাড়ের প্রায় সমতল পাথরের জায়গায় জায়গায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে রেখেছে। সেই সব পাথরের বুকে সুতোর মতো রেখায় নানান নকশা আঁকা রয়েছে। খিলান, অথবা অন্তরালের স্তম্ভ এবং এমন কি মূর্তির নকশাও। যা দেখলেই স্পষ্টত অনুমান করা যায়, সূক্ষ্ম ছেনি হাতুড়ি দিয়ে প্রধান শিল্পী নকশাগুলো এঁকেছিলেন, পরবর্তী কর্মীদের সে সব আর বৃহৎ যন্ত্রে কাটা হয়ে ওঠেনি শিল্পীদের খোদাই কাজ অসমাপ্ত থেকে গিয়েছে। মন্দির আর তার মূর্তিগুলো দেখলেই বোঝা যায়। খাজুরাহোর আর ভোজপুরের শিল্পীগোষ্ঠী নিশ্চয়ই অভিন্ন ছিল।

যে-পাহাড়ের ওপর এই মন্দির, তার গায়ে এখনো পাথর কেটে বসানো বাঁধের চিহ্ন স্পষ্ট। বেত্রবতী নদী ( স্থানীয় ভাষায় বেতোয়া ) এখন প্রবাহ বদলিয়েছে। কোনো এককালে এই পাহাড়ের কোলে দিয়েই প্রবাহিত ছিল, বাঁধ দিয়ে তাকে সামলাতে হতো। কোনো কোনো মতে, বেত্রবতীর জলকে ধরে রাখার জন্যই পাহাড়ের গা কেটে এই বাঁধ তৈরী করা হয়েছিল। আমি ভাবি বেত্রবতীর জলোচ্ছ্বাসের কারণেই, মহাদেব মন্দিরের কাজ কি অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল ?

কিন্তু তার থেকেও আমার বড় লাভ, ভোজপুরের পাথরের গায়ে শিল্পীদের কাজের প্রাথমিক সূত্রপাতের চিহ্ন। খাজুরাহোর আশ্চর্য মন্দির ভাস্কর্য যেন জীবন্ত প্রতিমাসমূহ কেবল শিল্পীর আবেগের সৃষ্টি

না। নিখুঁত মাপজোক বৈজ্ঞানিক ভাবনাও ছিল। তিলে তিলে গড়া তিলোত্তমা। পৃথিবীর কোনো শিল্পই অনায়াস সাধ্য না।

ফিরে যাই নৃত্যের মহোৎসবে। পৃথিবীর সব শিল্পের মতো নৃত্যও নয় অনায়াসসাধ্য যা কেবল চোখের সামনে রচনা করে এক স্বপ্নের জগৎ। আপাতস্তব্ধ মুগ্ধ-প্রাণের গভীরে রক্তে দেয় দোলা। খ্যাতনামা যে-নৃত্য-শিল্পীকে মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছি, তাঁর এবং তাঁদের সকল কলাকুশলতা আর অপরূপ ভঙ্গিই দেখেছি মন্দিরগাত্রে। এই মন্দিরসমূহের বয়স যদি হয় হাজার বছর তবে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সৃষ্টি দু হাজার বছরের কম না। তখন হয়তো জয়দেবের গীতগোবিন্দ পদ-বন্ধের সৃষ্টি হয়নি। হয়নি হয় তো পরবর্তীকালে বাদশাহী আমলে কথকের সঙ্গে ঠুংরি বা গজলের সৃষ্টি। কিন্তু ছিল রাগ তাল ভাব ছিল ধ্রুপদ ধামার হোরি গীতিমালা। ছিল শব্দম্ পদম্ বর্ণম্ শৃঙ্গার।

পৌরাণিক বললেই ধর্মের কথা আসে এবং বলা হয়ে থাকে শাস্ত্রীয় নৃত্যের সকল সৃষ্টির মধ্যেই ধর্মীয় সংকেত। ইতিহাস বিচারের আলোচনার ক্ষেত্র এটা না। কিন্তু পৌরাণিক শব্দের পারিভাষিক অর্থ মাত্রেই মাইথলজি না। শাস্ত্রীয় নৃত্যেও অতএব, কালে ও কালান্তরের মানুষের, আপন আপন যুগের অবদান আছে। শাস্ত্রীয় নৃত্যের মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভরতনাট্যমও যুগে যুগে তার আপন চরিত্রকে মাধুর্য মণ্ডিত করার জন্যই কিছু কিছু পরিবর্তন করেছে। যেমন ওড়িশি নৃত্য। একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সে নিশ্চয়ই অর্জন করেছে, কিন্তু তার প্রকৃত জন্ম ভরতনাট্যমের গর্ভ থেকে নয় কি ?

শাস্ত্রীয় নৃত্যের সংজ্ঞায় দেখছি তিনটি বৈশিষ্ট্য। এক : নৃত্ত। দেহের নানা ভঙ্গিতে, শিল্পীর একান্ত আপন সৌন্দর্যকে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা, অপরের জন্য না। দুই নৃত্য। বিশেষ একটি বিষয়কে দেহের ও মুখের নানা ভঙ্গিমায় ও অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করা। হাতের ও দেহের নানা প্রতীকী মুদ্রা নৃত্যের অঙ্গ। তিন : নাট্য। এর সঙ্গে হাত পা মুখের ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি কেবল মাত্র না। এর সঙ্গে মিশে

থাকে এক নাটকীয়তা, চোখের ইশারায়, ঠোঁটের নানা অভিব্যক্তিতে প্রতীকী মুদ্রায়, আর এর সঙ্গেই যুক্ত হয় গীতি আলেখ্য। আরো আছে তাণ্ডব ও লাস্য।

শাস্ত্রীয় নৃত্যের আর এক অঙ্গের নাম "অভিনয়"। অঙ্গের নানা ভঙ্গি, সঙ্গীত ও কথা, পোশাক ও সাজ ভাব ও আবেগ, এগুলো "অভিনয়" নৃত্যের অঙ্গ। অভিনয় নৃত্য পুরুষ এবং নারী উভয় শ্রেণীর শিল্পীরাই করতে পারেন, যেমন কত্থক। কিন্তু ভরতনাট্যম প্রধানত নারীর জন্যই। এ ক্ষেত্রে সঙ্গীতের বাণীতে যেমন থাকে ঈশ্বরের প্রতি উৎসর্গ, নৃত্যের মূল ভিত্তিও তাই। আমার মনে হয়েছে, মন্দিরগাত্রে যত গুলো নর্তকীর মূর্তি দেখেছি, সবগুলোতেই ভরতনাট্যমের ভঙ্গি ও অভিব্যক্তি। এবং সম্ভবত মন্দিরের দেবদাসীদের সকলের আয়ত্তেই ছিল এই ভরতনাট্যম। কিন্তু গানগুলো ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হলেও, তা মূলত প্রেম সঙ্গীত। হয় তো সেই প্রেম নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তাহে।

অতীতে মন্দিরের পাথরের বিগ্রহের রক্তে দোলা লাগাতো কী না জানি না, ইতিহাস বলে, মন্দিরের রক্তমাংসের পূজারীরা সকলেই নির্বিকার থাকতে পারেননি। যেমন আমিও নির্বিকার নই পাথরের নর্তকীকে দেখে, এবং নই রক্তমাংসের আশ্চর্য সুরসুন্দরীবেশিনী খ্যাতনামা নর্তকীদের দেখে। তবে হায়, কাল বহে যায়! কমলা এবং পদ্মা সুব্রহ্মনিয়ম ছাড়া, প্রায় সব খ্যাতনামা ভরতনাট্যম শিল্পীদের অঙ্গে লেগেছে, অস্তাভার রক্তিমতা। যদিও যামিনী কৃষ্ণমূর্তির সম্পর্কে এ কথা বলতে এখনো আমার জিভ জড়িয়ে যায়। ডিসেম্বরে তাকে দেখেছি হাফিজ আলি স্মরণোৎসবে, রবীন্দ্র সদনে, তারপরে ফেব্রুয়ারিতে খাজুরাহোর মন্দিরের পটভূমিতে। অন্ধ্রপ্রদেশের একটি নৃত্য নাট্যের নাম কুচিপুড়ি। নামোৎপত্তির কারণ কুচিপুড়ি গ্রাম থেকেই এই নৃত্যনাট্যের উদ্ভব। অতীতে পুরুষরাই এই নৃত্যে অংশ গ্রহণ করতেন, পরবর্তীকালে এগিয়ে আসেন মহিলারাও। তাদের মধ্যে উজ্জ্বলতম নাম, আবার সেই যামিনী কৃষ্ণমূর্তিই!

কথক প্রধানত উত্তর ভারতের। তার বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে প্রধানত কয়েকটি ভঙ্গিতে ও আচরণে। ঠাট, সালামি, অমদ, ঠাট লয়ের টুকরা, টাটকর। দ্রুত লয়ের টাটকর টুকরা নাচ টুকরা, সঙ্গীত টুকরা, তোড়া, তবলবোল, পরমেলু গতনিকস, গত ভাও। গতনিকস-বাণী গতভাওগীতিকাব্য।

কথকের জগতে এখনো বিরজু মহারাজই মহারাজা। কিন্তু তাঁর চোস্ত পাঞ্জাবি বস্ত্রের কোমরবন্ধনী ইত্যাদি দেখলেই বোঝা যায় কথক একদা যে-রূপেই জন্মলাভ করে থাক বাদশাহী আমলে তার কিছু পরিবর্তন হয়েছিল। দেখছি, কথকের সঙ্গে যেমন "রতিথসুসারে গতম-ভিসারে মদনমনোহরবেশম্" যেমন চলে তেমননিই চলে,"কাহে রোকত ডাগর প্যারে নন্দলাল মেরী"-র ঠুংরি এবং ভোজপুরী ব্রজভাষা, সব রকমের ভাষার গানই ব্যবহৃত হয়। বোধ হয় হয় না কেবল বাঙলা।

কিন্তু পনরই ফেব্রুয়ারিতেই হরিষে বিষাদ। সেদিন ছিল কবিতা শ্রীধারনীর ভরতনাট্যম। আমাদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো, বজ্র বিদ্যুৎসহ খাজুরাহোর আকাশ জুড়ে নামলো অকাল বৃষ্টি। ষোল তারিখে এসে পড়লেন বিরজু মহারাজ। হায়, সেদিনও বৃষ্টি। কবিতাকে আগেই জিজ্ঞেস করেছিলাম সব থেকে বয়ঃকনিষ্ঠা শিল্পী চলে যাবেন কী না। বলেছিলেন, যাবো না। মহারাজের নাচ দেখবো। কিন্তু বৃষ্টি?

এই বৃষ্টিই মধ্যভারত ট্যুরিজম বিভাগের ডিরেক্টর মাহাশয়ের মেজাজ গোলমাল করে দিল। খাজুরাহোর সাহেবী হোটেল—হোটেল চান্দেলার মিটিংরুমে তিনি নাচিয়ে দিলেন বিরজু মহারাজকে। হাজার হাজার দর্শকের জায়গায় সে ঘর তো সিন্ধুতে বিন্দু। ফলে পরের দিনই মাইকের চিৎকার ফেটে পড়লো খাজুরাহোর সদরে: "বাগচি (ডিরেক্টর ট্যুরিজম সঃ ভাঃ) মুর্দাবাদ। অফিসারশাহী নহি চলে গা/ বিরজুকো নাচ চাহি মন্দির মে।"

আমি সুখী হতাম, যদি জনসাধারণের এই দাবি ও ধিক্কারগুলোকে

মিথ্যা বা মতলবী বলতে পারতাম। কেন না, সতরো তারিখের সকালবেলায় যখন এই কাণ্ড চলেছে, আমি তখন বিরজুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে মন্দির দেখছি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী তাঁর অভিপ্রায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমি আজকের রাতটাও থেকে গিয়ে, শেষ চেষ্টা করবো।"

শিল্পীজনোচিত বাক্য বটে। সতেরো তারিখে কুমকুমলালের ওড়িশি নৃত্য ছিল আর সেই তারিখেই কবিতা, কুমকুম এবং বিরজু তিন জনের অনুষ্ঠানই হয়েছিল। অর্থাৎ একের মধ্যে তিন। কবিতা আর বিরজু একাধিক দিন থেকে তাঁদের কথা রেখেছিলেন। ট্যুরিজমের কর্তাদেরও মুখরক্ষা।

শেষ দিন যামিনী কৃষ্ণমূর্তি।

শেষ করার আগে, দুটি কথা। কবিতা শ্রীধারণীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কলকাতায় নাচতে আসুন না কেন? জবাব: "ডাকছে কে?" আমাকে যিনি লিখে নাচের বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা করবার সুযোগ দিয়েছেন, তিনি কলকাতার কথক শিল্পী, অমিতা দত্ত। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে, জ্যোৎস্নালোকিত খাজুরাহোর মন্দিরগাত্র থেকে তাকে কি নেমে আসতে দেখতে পারি না?

জবাবটা দিতে পারেন দিল্লি ভোপালের ট্যুরিজম বিভাগের কর্তারাই।

এত কথা বললাম, তবু মন্দিরের কথা ভুলতে পারি না। নৃত্যের মহোৎসব সেখানেই, সেখান থেকেই তারা নেমে আসে, খ্যাতনামা শিল্পীদের ছদ্মবেশে। এই স্বপ্ন আমার গৌরবের।

এবার রূপ হতে রূপান্তরের ভিন্ন হাটে। একের অপরূপ ছন্দ ও তাল থেকে যৌথ নৃত্যের এক রূপ, মিলিতছন্দিত-মত্ত-পদচারণা ও দেহ হিল্লোলের বন্য সুষমায়, সেই রূপান্তরের হাটে বাজে জগঝম্প, সমবেত স্বরের গান বাতাসে ভর করে, মুখরিত করে আকাশ। বাঁশি বেজে ওঠে যেন সেই এক কোন দূরকালের আদিম আরম্ভ থেকে।

ইংরেজীতে কী বলতে হবে এই জীবনের নাচ ও জয়গানকে? কলেকটিভ? হ্যাঁ, যৌথ সে-কথা তো প্রথমেই উচ্চারণ করেছি। কিন্তু শাস্ত্রীয় নৃত্যের মতো, এই যৌথ নাচ বাজাবাজনা গানেরও কি নেই কোনো নির্দেশ? নেই উৎসর্গ? নেই কি আমাদের বুদ্ধির প্রতি কোনো আবেদন?

আছে, এই আমার বিশ্বাস। যে বিশ্বাস থেকে, নগ্নতার দিক থেকে, অশুভ গন্ধপ্রাপ্ত ঘোড়ার মতো ফিরিয়ে নিতে পারিনি ঘাড়, লোম খাড়া করে পারিনি নাক কোঁচকাতে, সেই বিশ্বাস থেকেই বুঝেছি, যৌথ নাচে গানে বাজনায়, উচ্চারালের নাটকীয় উল্লাসেও রয়েছে এক কাব্যের নির্দেশ। রয়েছে জীবনকে আহরণের কঠিন প্রয়াস, আপনাকে উৎসর্গের এক বিশ্বাস-মত্ত উল্লাস।

"নগ্নতার চতুর্দিকে একটা দীপ্ত লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই সেই লাবণ্য-দীপ্তির মধ্যে সৌন্দর্যের আত্মা সন্নিবিষ্ট। নগ্নপ্রকৃতির হৃদয়ে ডুবিয়া দীর্ঘ জীবন পথের কাতর কোলাহল আমরা যে বিস্মৃত হই, সে কেবলই এই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্য।...নগ্নতায় আত্মা পরিব্যাপ্ত।" সেই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্যকে, মন্দিরগাত্র থেকে নেমে

আসতে দেখেই নৃত্যপটিয়সী শিল্পীকে কালের নির্ণীত স্বরূপে, যেখানে আত্মোৎসর্গ মৌল প্রেরণায়। সে অবদান একার। বড়জোর যুগলের।

এ রূপান্তরের হাট ভিন্ন, যদিও মনে করি তার আত্মোৎসর্গও মৌল প্রেরণাজাত। কিন্তু এখানে স্তনে চন্দন লেপন, শৃঙ্গারে বিবিধ ভঙ্গি নেই। এখানে যৌথ জীবনের শিকার উল্লাস, বীরত্বের হুংকার, দলবদ্ধ মিলনের গান অরণ্যে পর্বতে জীবনযাপনের নাটকীয় ঘটনার প্রবাহ। এখান থেকে মন্দির দূরে। এখানে আছড়িয়ে পড়ে বিরাট তরঙ্গ ধ্বনি ও শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণ। তখন সে প্রাঙ্গণ আর প্রাঙ্গণ থাকে না, বিন্ধ্যাচলের স্তব্ধ চূড়া জেগে ওঠে বৃহৎ মাদলের ডিমি ডিমি শব্দে, অরণ্যের প্রহেলিকায় বেজে ওঠে উৎসবের করতালি।

মধ্যপ্রদেশ ট্যুরিজমের সচিত্র প্রোগ্রামে সেই দেশের আদিবাসীদের কোন চিত্র ছিল না। মন্দির প্রাঙ্গণের মূল প্রোগ্রামের সঙ্গে, ক্ষুদ্রাক্ষরে ঘোষণা ছিল শাস্ত্রীয় নৃত্য ব্যতীতও বাড়তি আকর্ষণের মধ্যে যা থাকবে, তা হলো "মীনাবাজার" "ট্রাইবাল ড্যানসেস অ্যারাউণ্ড এ ফায়ার" আর তার সঙ্গেই জুড়ে দেওয়া হয়েছে "ওয়াইলড লাইফ সাংচুয়ারিজ" এবং বিবিধ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আর নিকটবর্তী পান্নার হীরকখনি।

মনে করি না, এটা আমার দুর্বলতা, যে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী-দের সাক্ষাৎ পাবার কৌতূহল আর উৎসাহ আমার দীর্ঘকালের। সচিত্র প্রোগ্রামটি দেখবার আগে, কলকাতায় যখন আমার বন্ধুর মুখে, আদিবাসীদের নৃত্যানুষ্ঠানের কথা শুনেছিলাম, তখন আমার মুগ্ধ-ব্যাকুল প্রাণের যতোখানি আকর্ষণ ছিল মন্দির প্রাঙ্গণে শাস্ত্রী নৃত্যানুষ্ঠানের প্রতি, ঠিক ততোখানিই ছিল আদিবাসীদের আগুন ঘিরে নাচের প্রতি। বরং বলা ভালো, আদিবাসীদের অনুষ্ঠানের প্রতি আকর্ষণ কিছু বেশিই ছিল, কারণ তাঁদের উৎসব অনুষ্ঠান দেখাটা আমাদের ভাগ্যে জোটে কালেভদ্রে। শাস্ত্রীয় নৃত্যশিল্পীদের নাচ ভারতের যে-কোনো বড় শহরেই প্রায়শ দেখবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে। যথা, ফেবরুয়ারিতে খাজুরাহোতে যাবার আগেই আমাদের

যুগের দুই মহত্তম শিল্পীর নাচ দেখেছি ডিসেম্বরে। রবীন্দ্র সদনে। বিরজু মহারাজ—কত্থকের যিনি সম্রাট, ভরতনাট্যমের সম্রাজ্ঞী যামিনী কৃষ্ণমূর্তি—উভয়েই কলকাতার দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন হাফিজআলি স্মরণোৎসবে।

বলবো না, তাঁদের নৃত্যানুষ্ঠান দর্শন খুবই সুলভ ব্যাপার। কমারশিয়াল আর নন-কমারশিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলোর দৌলতে, আমরা শহরবাসীরা তবু তাঁদের দেখা মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি। কিন্তু যাঁরা আছেন ভারতের নানা অরণ্য পর্বতের দিকে দিকে ছড়ানো, তাঁদের উৎসব অনুষ্ঠান আমাদের কাছে একান্তই দুর্লভ। তাও আবার ট্যুরিজম বিভাগের ব্যবস্থাপনায়। সেদিক থেকে মধ্যপ্রদেশের ট্যুরিজম ডিরেকটরেটকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে থাকতে পারছি না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দু-একটি প্রসঙ্গের অবতারণা না করাটাও অসম্ভব। ডিরেকটরেট অফ ট্যুরিজম মধ্যপ্রদেশ, অথবা খোদ আই টি ডি সিকেই বলি, তাঁদের প্রচারের ধরন-ধারণ দেখে, স্পষ্টই বোঝা যায়, দেশের মানুষের থেকে, বিদেশের মানুষকে আকর্ষণ করাটাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। এতে আপত্তির কিছু দেখি না। আমি বিদেশী মুদ্রা উপার্জনের বিষয়টি বাদ দিয়েও বলতে পারি, ভারতবাসী হিসাবে এটা আমাদের গৌরব, আমাদের আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি বিদেশের বন্ধুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো। জগৎসভায় আসন তো কেউ আমাদের এমনি এমনি দেবে না। নিজেদের মহৎ ঐতিহ্য দিয়েই তা আমাদের লাভ করতে হবে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য, হিসাবের ভাগাভাগিটা কোন্ অঙ্কের দ্বারা নির্দিষ্ট হবে? দেশের মানুষকে একেবারেই দূরে হটিয়ে? অথবা দেশের মানুষ কি তাঁদের কাছে কেবল প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের কিছু অফিসার এবং কিছু সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি?

আমার কথা যে ভুয়া না, তার প্রমাণ খাজুরাহোর সাধারণ মানুষই তাঁদের শ্লোগানে উচ্চারণ করেছেন, 'অফিসারশাহী নাহি চলে

গা।" বৃষ্টির কারণে বিরজু মহারাজকে কর্তৃপক্ষ চাণ্ডেলা হোটেলের মিটিং রুমে নাচিয়ে, তাঁদের মূঢ় (?) বিদেশপ্রীতি এবং অফিসারশাহীর প্রতি অতি প্রীতির প্রবণতাকেই প্রমাণ করেছেন। তাঁরা ভুলে যান কেন, ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতবাসী তাঁদের শিল্পকলা ঐশ্বর্য বিষয়ে ছিলেন বঞ্চিত। এমন কি সে-সবই ছিল তাঁদের কাছে অজ্ঞাত। আজ যখন সুযোগ এসেছে, তখনো সেই ঐশ্বর্যের মহিমাকে আড়াল করে রাখতে হবে, কেবলমাত্র বিদেশীদের দোহাই দিয়ে, আর অফিসারশাহীর গর্বিত অধিকার দিয়ে? কর্তৃপক্ষের অঙ্কে এতোটা ভুল হওয়া বোধ হয় উচিত না। তাঁরা কি দেশ-বিদেশের মানুষের মিলনক্ষেত্রও করে তোলার সুযোগ পেতেন না, এই সব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে?

কিন্তু হায়, স্বাধীন স্বাধীন বলে এতো হাঁকডাকের পরেও দেশী সাহেবদের চিত্ত চরিত্র যেথায় ছিল, সেথায়ই আছে।

আজকের কলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার প্রথম পাতার শীর্ষেই একটি ফটো বেরিয়েছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই ওড়িশার কোরাপুটের আদিবাসী রমণীদের প্রতি করজোড়ে নমস্কার নিবেদন করছেন। আজ দরিদ্র হরিজন, আদিবাসীদের নিয়ে রাজনীতির উচ্চকণ্ঠ খুবই মুখরিত। রাজনীতির ব্যাপার তো, অতএব এর মধ্যে কতোখানি আন্তরিকতা, আর কতোখানি কেবলই আসন বাঁচানোর, পালটা আসন গড়বার কাজ গোছানো, জানেন কেবল রাজনীতির অন্তর্যামী। কিন্তু যে-কোনো দায়ে পড়েই হোক, শাসক এবং বিরোধী দলগুলো, হরিজন এবং আদিবাসীদের কথা প্রত্যেকটি সভাতেই বলছেন। তবু, ক্ষুদ্র খাজুরাহো শহরের সকল সুখ-সুবিধা থেকে আদিবাসীদের কেন তিন-চার কিলোমিটার দূরে একটি সামান্য ধর্ম-শালায় সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

আদিবাসী যৌথ নৃত্যের ও গানের আবেদন নিশ্চয়ই শাস্ত্রীয় নৃত্য থেকে আলাদা। কিন্তু সম্ভবত তাঁরাও শিল্পী হিসাবেই আমন্ত্রিত

ছিলেন। তবে তাঁদের এমন বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল কেন? কোনো টেকনিকাল কারণ থাকলে আলাদা কথা। হয় তো আদিবাসীরা দূরের ধর্মশালার ঘরের মেঝেয় দলা পাকিয়ে শুয়ে বসে ভালোই ছিলেন। কিন্তু যে-ভাবে তাঁদের থাকতে দেখেছি, নিতান্ত মানবিক কারণেই জিজ্ঞাসাটা মনে এলো।

এ প্রসঙ্গ এ পর্যন্তই থাক।

মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীরা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি বিচিত্র বর্ণাঢ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ভৌগোলিক চিত্রের মধ্যেই তাঁদের গোষ্ঠীগত ভিন্নতা ফুটে উঠেছে। মধ্যপ্রদেশ এমন একটি দেশ, যাকে ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো প্রদেশ। তার বিভিন্ন সীমায় বিভিন্ন আদি বাসী জনেরা রয়েছেন, এবং সকলেরই রয়েছে নিজস্ব বৈচিত্র্য। ওড়িশা, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, প্রতিটি সীমান্তেই এই বিচিত্র বৈশিষ্টার ছড়াছড়ি। এক যাত্রায় আমাদের এই বিশাল দেশটির সর্বত্র ঘুরে বেড়াবো, এমন ক্ষমতা আমার ছিল না। অথচ মনে মনে এমন একটি অলীক বাসনা ছিল।

বাসনা ছিল বিশেষ করে, খাজুরাহোর প্রাঙ্গণে যে-সব আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নৃত্যানুষ্ঠান দেখবো, তাঁদের সেই নাচ গান বাজনার সঙ্গে জীবনের যোগসূত্র খুঁজতে যাবো পাহাড় অরণ্যের বসতিতে। সেই বাসনা যে কেবল অপূর্ণ থেকে গেল তা নয় মাত্র অঞ্জলিভর পান করে ফিরে আসতে হলো তৃষ্ণার্ত হয়ে। সে তৃষ্ণা এতোই গভীর, মধ্যপ্রদেশের হাতছানি সদাই আমার চোখে। ডাক শুনছি তার নিরন্তর, সাড়া দেবার সময় কবে হবে, জানি না।

মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন বিশাল আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে, আমার প্রথম কৌতূহল আর উৎসাহ জেগেছিল ছোটনাগপুরের এবং তার সীমান্তবর্তী ওড়িশার পাহাড় অরণ্যের আদিবাসীদের দেখে। তাঁদের চিনতে, জানতে বুঝতে, একবার না একাধিকবার আমি ছুটে গিয়েছি। দেখেছি সাঁওতাল সেখানে খুবই কম। প্রধানত মুণ্ডা এবং ওরাঁওদের

বাস। তাঁদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে, সেই প্রথম আমার নৃতাত্ত্বিক এঙ্গেলস-এর "স্পেকটিক্যাল অফ প্রসটিটিউশন"-এর কথা মনে পড়েছিল। তাঁদের জীবনযাপনের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ আমাদের থেকে এতোই পৃথক, তথাকথিত সভ্য জগতের মানুষ আমরা দিশাহারা হয়ে যাই। তাঁদের অবারিত মেলামেশা, তাঁদের নাচগান পান ভোজন, তাঁদের সংক্ষিপ্তবাস, কলাহাস্যে উৎফুল্ল উল্লাস, আমাদের সভ্যতার প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলে বুকে হাঁটা সরীসৃপের মতো। তখন সহজের পাশে আমরাই অসহজ। সারল্যের পাশে জটিল ও কুটিল। অনায়াস আনন্দ উচ্ছলতার পাসে মূর্তিমান উচ্ছৃঙ্খল। ফলে দূরত্ব বাড়ে, সন্দেহ আর শত্রুতা বাড়ে। অবিশ্বাস আর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অথচ তা হবার কথা না। পরস্পরকে বুঝতে পারার মধ্য দিয়ে, সেখানে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অনায়াসে। সেখানে হাতের ইশারা, চোখের ইশারা অচল। সেখানে আমি যতো অনায়াস আর সহজ সে ততোধিক। সভ্যতার অঙ্গন থেকে যাত্রার পূর্ব মুহূর্তেই তাই "স্পেকটিক্যাল অফ প্রসটিটিউশন"টি দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হয়। চশমা—এমন কি মহৎ সংস্কৃতিবানদেরও রক্তে মজ্জায়। ওটাকে ছিন্ন করতে, বিবেকের থেকেও বড় কথা আন্তরিকতা। সভ্যতার অহমিকাকে ধূলায় লুটিয়ে দেওয়া। সংযম আর প্রেম সেখানে বুকের দু পাশে পাশাপাশি লীলা করে। রমণীর অনাবৃত বক্ষ সেখানে মহৎ। মত্ততা সেখানে অবসাদের পূর্বানুষ্ঠান না। চুম্বন সেখানে অপ্রচলিত। শহুরে পোশাক পরা শহুরে মানুষ মাত্রই সন্দেহজনক, তাঁদের ধ্যান ধারণায় অশ্লীল। প্রাচীনতমকালের মাতৃতন্ত্র সেখানে এখনো সামাজিক রীতি। এই সব বৈপরীত্যকে মেনে নিয়েই, তাদের সঙ্গে আমাদের সার্বিক মিলনের সম্ভাবনা। অন্যথায় হিতে বিপরীত।

গল্প বলার অবকাশ এখানে নেই, কিন্তু রাত্রের অরণ্যে, বিরাট অগ্নিকুণ্ডের আলোয়, আদিবাসীদের নাচের আসরে, সংস্কৃতিবান শহুরে

প্রতিভাকে আঘাতে রক্তাক্ত হতে দেখেছি। আবার দেখেছি শহরের শুভাকাঙ্ক্ষীকে মেয়েরাই টেনে নিয়ে গিয়েছেন তাঁদের নাচের আসরে, আপন হাতে করিয়েছেন পান ভোজন।

অস্বীকার করার উপায় নেই, আদিবাসীদের মূল ধ্যান-ধারণা নাড়া খাচ্ছে, কাঁপন লাগছে তার সমাজ দেহে, চিড় খাচ্ছে কোথাও কোথাও। কেবল বানিয়া আর ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তর্জনী দিয়ে দেখাবো না। দেখাবো রাজনৈতিক দলগুলোকেও। এই তিনটি বিভাগ নিজেদের প্রয়োজনে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর একজনকেও রেহাই দিতে রাজী নয়।

থাক এই সব অশুভ ভাবনা। খাজুরাহোতে প্রথম সন্ধ্যায় সংযুক্তা পাণিগ্রাহীর নাচ দেখেই ছুটে গিয়েছিলাম আদিবাসীদের নাচ দেখতে। আগুন ঘিরে নাচের আগুনের বহর ছিল খুবই কম, প্রায় নিবু নিবু বলা চলে। অন্যথায় আগুনের আলোয় নাচের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠতে পারতো। কিন্তু কর্তৃপক্ষ আলোর কার্পণ্য করেননি, এবং নিয়নের সেই আলোয় নাচ দেখার সুবিধা হয়েছিল ঠিকই, আরণ্যক উল্লাস ও সৌন্দর্য ছিল না।

খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, আসরে উপস্থিত ছিলেন, মারিয়া, বৈগা আর গোন্দ আদিবাসী গোষ্ঠী। আগুনের আলো না থাক, বৈগাগোষ্ঠীর রণপা নৃত্য দেখে চমৎকৃত হয়েছিলাম। রণপা বলতেই আমার চোখে ভেসে ওঠে, বাঙলা দেশের অতীতের ডাকাতদের কথা, যাদের চোখে দেখিনি, গল্প শুনেছি। রণপা—অর্থাৎ দীর্ঘ ছুটো বাঁশের গাঁটে দু পা রেখে, ছুটে চলা। ডাকাতরা নাকি রণপায়ে চেপে বাঁশের বড় বড় পদক্ষেপে দ্রুত পালিয়ে যেতো। অনেক সময় খাল নালা ডিঙিয়ে যেতো অনায়াসে। সেই রোমহর্ষক ছবির ডাকাত ছুটে যেতো উঁচু গাছের পাশ দিয়ে, আকাশের নক্ষত্রের গা দিয়ে।

খাজুরাহোতে দেখেছিলাম, রণপা নৃত্যের অনায়াস ছন্দ। তাঁদের ভাষার রণপা নাচের নাম হলো "ডিটো এন্না"। তালে ভুল ছিল না,

সারিবদ্ধতায় কোথাও অমিল ঘটেনি। নাচতে নাচতে ঘন হয়ে আসা আবার ছাড়িয়ে যাওয়ার কৌশলটি তাঁদের যেন জন্ম থেকেই আয়ত্তে। এতোকাল যা আমার কাছে ছিল পলায়নপর ডাকাতদের দ্রুত এক কৌশল, খাজুরাহোতে দেখেছিলাম তা আরণ্যক, শিল্প।

পরের দিন থেকেই সেই সর্বনেশে বৃষ্টির পালা। আদিবাসীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, তাঁদের কাছ থেকে কিছু জানা, সবই বাকি থেকে গিয়েছিল। আশা ছিল পরের দিন রাত্রে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে যেতে পারবো। জেনে নিতে পারবো তাঁদের ঠাঁই-ঠিকানা, জীবনযাপনের ধ্যান-ধারণার কিছু সংবাদ।

বৃষ্টি নেমেছিল পনরই ফেব্রুয়ারি প্রায় বিকালে। সকালে খবর পেলাম, বামিঠার পথে, প্রায় ছ' কিলোমিটার দূরে বেনীগঞ্জ ড্যামের ধারে, আদিবাসীদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে মুভি তোলবার জন্যই। খবর পেয়েই ছুটলাম। আমাদের কাছেও ছিল একটি জীপ। দলটা নেহাত ছোটোখাটো ছিল না, তাই একটা অ্যামব্যাসাডর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু কপাল বলে একটা কথা আছে। কর্মের সঙ্গে সব সময়ে তাকে মেলানো যায় না। আমারা যখন গিয়ে পৌঁছুলাম, তখন সব খতম। বেনীগঞ্জ ড্যাম দেখাটা এমন কিছু আহা মরি ব্যাপার ছিল না। কারণ মাইথন মাসানজোরের তুলনায় সে বাঁধ তেমন নয়ন-ভোলানো না। তবে কপালে একটা বস্তু ছিল, ড্যামের টাটকা রুই আর কাতলা। ওটা বাঙালীর কপাল গুণে। মাছ ধরার ঠিকাদার তখন সব বস্তা বন্দী করে বসে আছে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরে সে তার ঠাসবুনোট বস্তা খুলতে রাজী হলো। দাম শুনলে চমকে উঠারই কথা। ছ' টাকা কেজি দরে বেশ কিছু মাছ কেনা হলো। তাঁবুর আস্তানায় ফিরে, কলসীর মতো হাঁড়িতে ফোটানো হলো খিচুড়ি। তরকারি না বলে, আলুকপির ছেঁচকি, আর মাছ

ভাজা। চড়ুইভাতির মতোই সেটি হলো একটি ভোজনের মহোৎসব।

মহোৎসব তো হলো বটে, ভাগ্যাকাশে তখন কিছু মেঘের ছড়াছড়ি। দুপুর গড়িয়ে যেতেই কলঙ্কিত আকাশে বিজলী হানা চমক, বজ্রের হুংকার, তারপরে ধারা পাত। ষোল তারিখের সকালটাও মোটেই আশার আলো নিয়ে হাসলো না। ব্যস্ত হয়ে উঠলাম আদিবাসীদের সাক্ষাতের জন্য।

"রাহিল" নামে ট্যুরিস্ট হোটেলে খোঁজ-খবর করে এক ভদ্রলোকের নাম জানা গেল, রাজা মুখার্জি। তিনি ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ারের রাজধানী অফিসের কর্মী। আদিবাসীদের খাজুরাহোতে নিয়ে আসার যোগাযোগ অনেকটা তাঁর হাতেই ছিল। সকালের মুভির ব্যাপারেও নাকি তিনি ছিলেন। আদিবাসীদের দায়িত্বও ছিল তাঁর ওপরে অনেকখানি।

রাজা মুখার্জিকে খুঁজে পাওয়া গেল রাহিলেই। যেচে আলাপ করলাম। বয়স এমন কিছু না। কিছু কথাবার্তার পরেই জানা গেল, রাজা মুখার্জি অন্তরে বাইরে একজন শিল্পী। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা কম না। তাঁদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নাচতে জানেন। চাকরির বাইরেও তিনি ছবি আঁকেন।

কাণ্ডারী যখন পাওয়া গেল, তখন ভাসতে দেরি করা নিরর্থক। রাজা মুখার্জি বললেন, "আকাশের যা অবস্থা দেখছি, দুপুরের খাওয়ার পরেই আদিবাসীদের ডেরায় চলে যাওয়া ভালো।"

তখনই জানতে পারলাম, আদিবাসীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে তিনি চার কিলোমিটার দূরে। জীপ নিয়ে রাজাবাবুর সঙ্গে জৈন ধর্মশালার একটি বড় ঘরে গিয়ে দেখলাম। রমণী পুরুষ শিল্পীরা সকলেই দলা পাকিয়ে, এ ওর ঘাড়ে মাথায় পা ছড়িয়ে. কোনোরকমে ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে আছেন।

বর্ষার জন্যেই শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছিল। সহজ ভাবনাটাই

মনে এলো, সবাই পান করে ভোর হয়ে নেই তো? রাজাবাবুকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতেই বললেন, "আদৌ না। নিজেদের তৈরি বস্তু ছাড়া ওদের চলে না, আর সে সব তৈরির কোনো সামগ্রীও সঙ্গে নেই।"

জিজ্ঞেস করে জানা গেল বস্তুর নাম "সালফি" আর "গাড়িয়া"। আমার মনে পড়ে গিয়েছিল ছোটনাগপুরের মুণ্ডাদের "ডিয়েং"-এর কথা। ডিয়েং পচাই ছাড়া কিছু না, একটু ঘুরিয়ে বললে খাঁটি "রাইস বীয়র"।

মারিয়া গোন্দ আর বৈগা, তিনটি গোষ্ঠীর মধ্যে, মারিয়া আর বৈগা দলপতি দুজনকেই রাজাবাবু আমাদের প্রার্থনার কথা নিবেদন করলেন। কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন কিঞ্চিৎ দ্বিধা দেখা গেল। তারপরেই দলপতিরা ডেকে তুললেন শিল্পীদের। সহসা যেন যাদুমন্ত্রে ঘরের চেহারা বদলিয়ে গেল। রব পড়ে গেল সাজো সাজো।

মেয়েদের পায়ের গোছার কাঁসার অলঙ্কার নুড়ায় ঠুংঠুং আওয়াজ হলো। পোশাক পরতে শুরু করলেন সব আমাদের সামনেই। মারিয়া পুরুষেরা মাথায় পরলেন দুরকমের শিরস্ত্রাণ। বরাহের দাঁতের সঙ্গে ভৃঙ্গরাজ পাখীর পালক গোঁজা, অনেকটা পাগড়ির মতোই। নাম তার "গুব্‌বা"। কড়ির পাগড়িতে মোষের দুই শিং। কোথাও বা তার ছোট আয়না বসানো, এই শিরস্ত্রাণের নাম "কোক্"। বড় বড় ঘণ্টার মালা—নাম যার "হিরণ", বন্য মহিষ শিকারী পুরুষ শিল্পীর তা হলো কোমরবন্ধ। সাজতে সাজতেই দুবার যখন কোমরে ঢেউ দিয়ে ঘণ্টায় শব্দ তুললেন, মনে হলো শিকারের ডাক পড়েছে। তা ছাড়া তাঁদের কানে আছে মাকড়ি, নাম যার "বারি"।

মেয়েরা কোমরে পরেন বড় ঘুংগুর, "মুইয়াং" যার নাম, তামারা পরলেন মাথায়, অনেকটা গোল টুপির মতো। কিন্তু মাথায় পুঁতির মালা এবং গলাতেও, পরতে অনেকেই ব্যস্ত। বিশেষ করে মাথায় জড়ানো পুঁতির বেষ্টনীর নাম "তালাকাস্‌রা"।

দেখলাম, মেয়েদের থেকে পুরুষদের সাজগোজ অস্ত্রসস্ত্র বাদ্য বেশি। মাদল তো অনেকের গলাতেই ছিল। মোষের শিংয়ের বাঁশি, "হাকুম্" যার নাম। বাঘের গায়ের মতো ডোরা কাটা বড় বড় লাঠি, মাথায় লোহার গুচ্ছ, নাম তার "গুজুর বড়গা" আর ছোট লাঠির নাম "কোলাং বরগা"। "কোটারকা" আছে গলায় ঝোলানো, দেখে মনে হয়, পশুর চামড়ায় তৈরি নাকাড়া। আসলে গোটাটাই একরকমের গাছের গুঁড়ি, চাঁটি মারলেই ঠং ঠং করে বাজে। পুরুষের আংডোচিতে ( পাগড়িতে) ছুরি গোঁজা থাকে, কারোর কারোর হাতে অতি ধারালো টাঙি।

এই যৌথ নৃত্যেয় সবটাই জীবনের প্রয়োজনে, প্রয়োজনই উৎসব। সবই জীবনযাপনের প্রতীক। বৈগা গোষ্ঠী প্রধানত এসেছেন মাণ্ডলা থেকে। বৈগা মেয়েদের সাজের মধ্যে সব থেকে মনোহারী "লাছা", যা ঘাসে বোনা এক ধরনের দীর্ঘ পালকের মতো মাথার পিছন থেকে পিঠে এলিয়ে পড়ে। ছেলেদের পায়ের "পায়জানা" অলংকার, নাচের তালে যে বাজনা বাজে, তার নাম "ঠিস্কি"।

মেয়ে হোক, ছেলে হোক, কারোকে একটি কথা জিজ্ঞেস করবার উপায় নেই। যেন লজ্জায় হেসেই মরে যায়। এই বনবালারাও কি তাঁদের ঠোঁটের কূলের চিকর হাসি দিয়ে, মন্দির গাত্রের সেই মোহিনী-মূর্তিকে মনে করিয়ে দেয়নি ? দিয়েছে। এবং প্রতিটি কথার জবাবেই কেউ নীরব থাকেন নি। জবাব দিয়েছেন, আর নিজেদের সঙ্গে চোখাচোখি করে হেসেছেন।

বিয়ে ? বিয়ের নিয়ম ? এও আবার কেউ জিজ্ঞেস করে নাকি ? কলকাতাইয়া বাঙালী তো আজব ভারি ! মাথার খোঁপায় গোঁজা চিরুনিটা দেখিয়ে দিয়েছেন হাসতে হাসতে, কথা হলো, "ওইটি যে পুরুষ পরিয়ে দেয়, সেই প্রেম নিবেদন।" প্রেম আর বিবাহ এখানে দ্ব্যর্থবোধক না। "তবে মহলোও কি না হয় ?" অর্থাৎ বাবা মায়ের পছন্দমতো সম্বন্ধ দেখে বিয়ে দেওয়া।

সাজগোজের শেষেই নাচ। বৈগারা নাচলেন ধর্মশালার প্রাঙ্গণে, দূরে মন্দির। আর মারিয়াদের জোড় হাতে টেনে নিয়ে গেলাম প্রাচীন জৈন মন্দিরের চত্বরে। বন্য মহিষ শিকার থেকে দেবদেবীর আরাধনা, বাদ গেল না কিছুই। শেষের গানটি ছিল :

বারাকিয়া তাতোর দাদালে······

শালিকাসিলো শয়োর ওঁহি তাতোর দাদলে······

লয়োর গোলা সোমোয়ে দাদালে

পলায়ে তানতম ভান্নদাখি

দাদালে···

রিলো লেয়ো রিলো রিলো······

শালিকাসিলো রিলো রিলো······

যার অর্থ হলো,

হে ভগবতী, আমরা তোমার মন্দিরে এসে পুজো করলাম। সমস্ত ছেলেমেয়েরা একত্র হয়ে নৃত্যগীতাদি করলো। হে মা! প্রার্থনা, আমাদের সব ত্রুটি ক্ষমা করুন।

ক্ষমা আমিও চাই, এই সব শিল্পীদের কাছে। কারণ, আমরা এবং তাঁরা, কেউ কারোকে পরস্পর তেমন করে চিনতে জানতে পারলাম না।